রাজ-তপস্বিনী

বা

মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবীর জীবনী-প্রসঙ্গ

শ্রীশচন্দ্র মজুমদার প্রণীত।
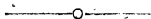
এস সি মজুমদার কর্ত্তৃক
২০, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
মজুমদার লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত
১৩১৯।

মূল্য এক টাকা।

স্বর্গীয়

প্রসন্নকুমার মজুমদার

পিতৃদেবের

উদ্দেশে

এই গ্রন্থ

উৎসর্গীকৃত।

নিবেদন।

স্বর্গীয় শ্রীশচন্দ্র মজুমদার অগ্রজ মহাশয়, গ্রন্থকার, বঙ্গদর্শনে ৺ মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবীর জীবনী-প্রসঙ্গ যে পর্য্যন্ত লিখিয়াছিলেন, পুস্তকাকারে তাহাই প্রকাশিত হইল। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, মহারাণী মাতার জীবনী-প্রসঙ্গ শেষ করিয়া, পরে মার জীবনচরিতও লিখিবেন, সে জন্য তিনি প্রস্তুতও হইয়াছিলেন। জীবনী-প্রসঙ্গ প্রায় শেষ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু জীবন-চরিত লিখিতে আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই মনের সে সাধ, সে ক্ষোভ, মনে রাখিয়াই তিনি লোকান্তরিত হইয়াছেন! স্বর্গীয় অগ্রজ মহাশয় মহারাণী মাতার জীবনী লিখিয়া যাইতে পারেন নাই, ইহা আমাদের দুর্ভাগ্য! তাঁহার সে সাধ পূর্ণ করি, সে সাধ্য আমাদের নাই, তবু তাঁহার শ্রীচরণ স্মরণ করিয়া, তাঁহার অবলম্বিত পথানুসরণে তাঁহার বহুদিনের ঈপ্সিত মহারাণী মাতার জীবন-চরিত আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে যেমন সম্ভব সত্বরই লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

১লা আশ্বিন, ১৩১৯।
কলিকাতা। } শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার।

শ্রীশচন্দ্র মজুমদার প্রণীত

ফুলজানি (উপন্যাস), তৃতীয় সংস্করণ	...	১।০
বিশ্বনাথ (বিশে ডাকাত) দ্বিতীয় সংস্করণ	...	১।০
শক্তিকানন (উপন্যাস) দ্বিতীয় সংস্করণ	...	১।০
কৃতজ্ঞতা (উপন্যাস) দ্বিতীয় সংস্করণ	...	৸০
রাজতপস্বিনী (জীবনী-প্রসঙ্গ) ...	...	১৲
দুর্ব্বাদল (গল্পের বই,) ...	...	যন্ত্রস্থ
পদরত্নাবলী (রবি বাবু ও শ্রীশ বাবু সম্পাদিত)	...	||৵০

শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার প্রণীত

চিত্রবিচিত্র (গল্পের বই) ...	...	১।০
ইন্দু (উপন্যাস)	...	||৵০
নীলকণ্ঠ (উপন্যাস) ...	...	যন্ত্রস্থ
পূজার ফুল (উপন্যাস) ...	...	

শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার প্রণীত

পঞ্চপ্রদীপ (গল্পের বই) ...	...	||৵০

শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার প্রণীত

দময়ন্তী (সচিত্র) ...	...	।৵০ ও ||৵০

মজুমদার লাইব্রেরী,
পুস্তক-বিক্রেতা ও প্রকাশক,
২০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

রাজ-তপস্বিনী।

[জীবনী প্রসঙ্গ]

পুঁটিয়ার স্বর্গীয়া মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবীর স্বামী রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় রাজশাহীতে নীলবিদ্রোহের একজন কর্ম্মিষ্ঠ নেতা ছিলেন। অতএব জেলার সাহেবসুবাদের বিরাগে বিপদ্ আশঙ্কা করিয়া কিছু-দিন সপরিবারে তাঁহাকে কলিকাতায় বাস করিতে হইয়াছিল। আমার পিতৃদেব, রাজার দেওয়ান, সঙ্গে ছিলেন। মাতাঠাকুরাণী ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে উৎকট বায়ুরোগে আক্রান্ত হন। চিকিৎসকেরা সিদ্ধান্ত করেন, পীড়াটি হিষ্টিরিয়াজনিত উন্মাদ। সুবিখ্যাত ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারা চিকিৎসার জন্য এই সময়ে তাঁহাকেও কলিকাতায়

লইয়া যাওয়া হয়। আমি তখন দেড় কি দুই বৎসরের শিশুমাত্র। শ্যামবাজারে রাজার বাসাবাটীর নিকটে আমাদের বাসা ছিল।

মহারাণীমাতার বয়ঃক্রম তখন ন্যূনাধিক দ্বাদশ-বর্ষমাত্র, সমস্তদিন একা থাকিতে পারিতেন না। অক্রূরনামে দাসী তাঁহার আদেশে প্রত্যহ আমায় তাঁর কাছে লইয়া যাইত। দিনমান আমায় অবলম্বন করিয়া আনন্দে তিনি সময় কাটাইতেন। তখন হইতে আমার প্রতি তাঁর যে অপত্যনির্ব্বিশেষ স্নেহ জন্মিয়াছিল, চিরজীবন তাহা সমান ছিল।

"ফুলজানি"র উৎসর্গপত্রে তাঁহার এই বাৎসল্য-ভাব, তদীয় স্বর্গারোহণের কয়মাস পরে স্বপ্নদৃষ্ট ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া চিত্রিত করিতে আমি প্রয়াস পাইয়াছি। অবশ্য অতটা শৈশবের কথা আমার নিজের মনে নাই। বড় হইলে মহারাণীমাতার মুখে যাহা শুনিয়াছি, তাহাই হৃদয়ে মুদ্রাঙ্কিত আছে। নারিকেল, কুল ও ইক্ষু আমার প্রিয়খাদ্য ছিল, তাহাই সংগ্রহ করিয়া প্রায় সমস্তদিন তিনি

আমায় কাছে কাছে রাখিতেন। কতবার সে সব গল্প করিতে করিতে তাঁহাকে মাতৃস্নেহে বিগলিত ও উৎফুল্ল হইতে দেখিয়াছি। আমার শৈশবের খুঁটি-নাটি আচরণগুলি কখনও তিনি বিস্মৃত হন নাই।

ত্রয়োদশবর্ষ বয়সে তাঁহার বৈধব্য ঘটে। বিষয় কোর্ট-অব্‌-ওয়ার্ডসে গেলে মহারাণীর পিতৃদেব স্বর্গীয় ভৈরবনাথ সান্যাল মহাশয় অবৈতনিক ম্যানেজার ও অভিভাবক নিযুক্ত হন। আমার পিতা অতঃপর কিছুকাল ওয়াট্‌সন্‌ কোম্পানির প্রধান কর্ম্মচারী হইয়া রামপুর বোয়ালিয়াতে অবস্থিতি করেন। ৭।৮ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত আমি দেশে ছিলাম, মহারাণীমাতাকে আর দেখি নাই। যাহা হউক, ১২৭৪ সালের শ্রাবণমাসে পিতাঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে মহারাণীমার আগ্রহে পুঠিয়ায় প্রথম গিয়াছিলাম, সে কথা বেশ মনে আছে। বর্ষাকাল, পুঠিয়ার চারিদিক্ বন্যাজলে পূর্ণ, এক বাড়ী হইতে অন্য বাড়ীতে যাতায়াতে নৌকা ভিন্ন গত্যন্তর নাই; —ইহা সেই ছেলেবেলায় আমার ভারি নূতনরকমের

মনে হইয়াছিল। মনে পড়ে, রাজবাটীর উদ্যান-সন্নিহিত বিতল গৃহে আমাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল এবং সে গৃহে অন্যান্য পুস্তকের মধ্যে একখানি কাদম্বরীর বাঙ্‌লা অনুবাদ দেখিতে পাইয়া গল্পটা খুব শীঘ্র পড়িয়া শেষ করিয়া ফেলিয়াছিলাম। নিষ্ঠুর ব্যাধ বৃক্ষকোটরের আশ্রয়স্থান হইতে পক্ষিশাবক অপহরণ করিয়া সজোরে আছড়াইয়া মারিতেছে—কাদম্বরীর এই করুণ চিত্র আমার তরুণ হৃদয়ে বড় আঘাত করিয়াছিল এবং পুঁঠিয়ার প্রাথমিক স্মৃতির সঙ্গে সে বেদনাটুকু মর্ম্মে মর্ম্মে জড়িত হইয়া আছে।

১২৭৭-৭৮ সনের পূজার পর পুনরায় আমরা পুঁঠিয়ায় গেলাম। মহারাণীমাতার অপত্যনির্ব্বিশেষ স্নেহ এবং তাঁহার অলৌকিক পবিত্রজীবনের ছায়ায় আমার পরম লাভ হইল। তাঁহার আদেশে প্রত্যহ সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে আমি রাজবাটী যাইতাম এবং প্রহর বাজিয়া না গেলে বাসায় ফিরিতে পারিতাম না। এই আড়াই-তিন-ঘণ্টা মাতা কতক আমার

সহিত, কতক বা তাঁহার চারিপার্শ্ববর্ত্তিনী আশ্রিতা সধবা-বিধবাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় কাটাইতেন। আমার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করার পরই সুধাইতেন— "আজ কি কি দিয়ে খাওয়া হোল?" তার পর অন্যান্য কথা হইত। ছুটির দিন ছাড়া সচরাচর প্রাতে বা মধ্যাহ্নে রাজবাড়ী যাইতাম না, কিন্তু অনিবার্য্য কারণে কোনদিন এই সায়ংকালীন মাতৃ-দর্শন বাদ গেলে আমি বিষণ্ণ হইতাম, তিনিও লোক পাঠাইয়া তত্ত্ব লইতেন- কোন অসুখ করে নাই ত? রাজবাটীর মহিলারা আমায় ঘরের ছেলে মনে করিয়া অসঙ্কোচে গল্পগুজব করিয়া যাইতেন, তাহাতে মধ্যে মধ্যে রাজবাটীর ছোট-বড় কর্ম্মচারীদের সমালোচনাও পুরামাত্রায় রীতিমত না চলিত, এমন নহে। কিন্তু বাহিরে আসিয়া সে কথা কখন আমি কাহারও কাছে বলিতাম না। এই সময়ে মহারাণীমাতার সাবালিকাবস্থায় বিষয় কোর্ট-অব্-ওয়ার্ডস্-মুক্ত হওয়ার পর, শেষে যিনি দেওয়ান ছিলেন, তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করার প্রয়োজন হইয়া-

ছিল এবং পিতৃদেবমহাশয়কে সে পদে নিযুক্ত করার কথা চলিতেছিল। স্বপক্ষ-বিপক্ষ সকল দলের কথা শুনিতে-বুঝিতে পারিতাম না, এমন নহে। কিন্তু পিতা কখন কিছু জিজ্ঞাসা করিলেও মৌনী থাকিতাম। এই খবর কি করিয়া মহারাণীমাতা জানিতে পারিয়া প্রীত হইয়াছিলেন। কিন্তু ইহা তাঁহারই দৃষ্টান্তের ফল। আমি দেখিতাম, কথাবার্ত্তায় অধিকাংশসময়ে তিনি শোভা মাত্র।

আমার সমক্ষেই তাঁহার শয্যা রচিত হইত। প্রকাণ্ড দরদালানের মধ্যস্থলে শীতের সময় দেখিতাম হর্ম্ম্যতলে একখানি মাদুরের উপর সামান্য পাতলা তোষক বৃহৎ একখণ্ড চাদরে আবৃত, তাহাতে একটি-মাত্র লেপ ও উপাধান। গ্রীষ্মের দিনে একটি শীতল-পাটিমাত্র। চারিদিকে আশ্রিতা আত্মীয়া ও অনাথা ব্রাহ্মণ বিধবাদের শয্যা পড়িত। কি শীত কি গ্রীষ্মে পরিধেয় একমাত্র বারহাতের মোটাথান সচরাচর ময়মনসিংহের জমিদারী পুখুরিয়া পরগণ হইতে সে বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া আসিত। অগ্রহায়ণ

পৌষ-মাসে অপরাহ্নে প্রণাম করিতে গিয়া প্রায় প্রত্যহ দেখিতে পাইতাম, কিছুমাত্র পূর্ব্বে হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিয়া রাণীমাতা শীতনিবারণ জন্য পিত্তলের আঙটায় রক্ষিত অগ্নিতে হাত সেঁকিয়া লইতেছেন— পরিধানে সেই একমাত্র থান। অবশ্য দিনের মধ্যে অনেকেবার তাহা পরিবর্ত্তিত হইত। সকল ঋতুতে তাহাতেই আপাদমস্তক আবৃত থাকিত; কেবল কখন কখন দেখিতাম, মাথার চুল বাড়িলে দাসীরা তাহা কাটিয়া দিতেছে। রাজশাহীতে, বিশেষতঃ পুটিয়ায় দেখিতাম, নাপিতানীরা ক্ষৌরকার্য্য করে না। অতএব প্রয়োজনমতে নরসুন্দরেরা রাজান্তঃ-পুরে প্রবেশলাভ করিতে পারে। নখ কাটিবার সময় মহারাণীমাতা দীর্ঘ ঘোম্‌টা টানিয়া বসিতেন। একবার নরসুন্দর অনবধানতাবশত নখ বেশী করিয়া কাটিয়া ফেলায় তাঁহার অঙ্গুলিতে রক্তপাত হইল। ভৃত্য ও দাসীরা ইহাতে কুপিত হইয়া উঠিলে, তিনি অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে আমাদের দিকে সহাস্যে চাহিয়া ইঙ্গিতে সকলকে নিবারণ করিলেন।

দীনদুঃখী এবং এই পাপতাপময় সংসারের সকল শ্রেণীর আর্ত্তের প্রতি তাঁর যে অনির্ব্বচনীয় আড়ম্বরমাত্রশূন্য করুণার ভাব প্রতিনিয়ত দেখিতাম, তাহাতে ইহাই বুঝিতাম যে, তাঁর কাছে ছোট-বড় পাপিপুণ্যাত্মা সকলেই সন্তানতুল্য। কিন্তু পাপের প্রতি যে মর্ম্মান্তিক ঘৃণা অনুদিন তিনি পোষণ করিতেন, তাহাও কার্য্যে প্রকাশ পাইত। একদিন প্রাতঃকালে অন্দরে খবর আসিল, একটী স্ত্রীলোক তাঁহার কাছে নালিশ করিতে আসিয়াছে। উহার অসচ্চরিত্রতার কথা মহারাণীমাতার গোচর হইয়াছিল। দেখা করিলেন না, কিন্তু যাহাতে সে সুবিচার পায়, তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। আপনার লোক কেহ,—আত্মীয়ই হউক আর আশ্রিতই হউক,—কোন অন্যায় কি অংশের কাজ করিয়াছে শুনিবামাত্র তিনি কেবল অজস্র অশ্রু-পাত করিতেন। অপরাধী ইহাতেই শাসিত হইত, অন্য কোনরূপ দণ্ডদান করিতে তিনি জানিতেন না। আমার পুঠিয়াবাসের প্রথমবৎসর বর্ষাকালে প্রবল বন্যা

উপস্থিত হওয়ায় গরিব রাইয়তেরা বড় কষ্টে পড়ে। পুঠিয়ার রাজাদের বিষয়-আশয় অংশমত অনেককাল ভাগ-বাটোয়ারা হইয়া থাকিলেও সকল অংশের প্রজারা এই সময়ে তাঁহার সাহায্য তুলারূপে লাভ করিয়াছিল। রাজবাটীর সম্মুখে স্ত্রীপুরুষের জন্য অন্নবস্ত্র ও গবাদির জন্য খাদ্য বিতরণের যথেষ্ট আয়োজন হইয়াছিল। মহারাণীমার বিশেষত্ব এই দেখিতাম যে, বাহিরবাটীর চাঁদের কোঠার আশ্রয় লইয়া খড়খড়ির পথে নিজে সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। তখনকার করুণ মুখচ্ছবি আজও আমার মনে পড়িতেছে। ইহার কিছুকাল পরে একবার অগ্নিদাহে পুঠিয়ার প্রায় সকল লোকের খড়োবাড়ী পুড়িয়া যায়। লোকের কষ্টের কথা শুনিয়া মা তাহা মোচনের বন্দোবস্ত যথাসাধ্য করিয়াছিলেন, ইহা বলা বাহুল্য। কিন্তু সেই সঙ্গে দুইতিনদিন মাতাকে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে দেখিয়াছিলাম, তাহাতেই আমার হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল। রাজবাটীতে সর্ব্বদাই প্রায় পর্ব্বাদি উপলক্ষে সমারোহে

ব্রাহ্মণ প্রভৃতি ভোজন করান হইত। খাদ্যসামগ্রী চুরী যাওয়ার কথা শুনিলে হাসিয়া তিনি বলিতেন, "খাবার জিনিস কখন লোকসান হয়? কেহ না কেহ ত খাবেই!"

বসন্ত ও গ্রীষ্মকালের সন্ধ্যায় দেখিতাম, মাতা একরাশি ফুল লইয়া রাজপরিবারের গৃহদেবতা গোবিন্দজীর জন্য মালা গাঁথিতেছেন। তাঁহার (পাঁচ-আনির) অংশের পালা পড়িলে প্রত্যহ স্বহস্তে মালারচনা করিয়া তিনি দেবতাস্থানে উপহার পাঠাইতেন। পালা পড়িলে এক রাজ-বাটীর গোবিন্দবাড়ী হইতে অন্য বাটীর গোবিন্দ-বাড়ী বিগ্রহ লইয়া যাওয়ার সময় চিরদিন ধুমধাম হয়। তদুপলক্ষে হাতিঘোড়া-লোকজন যেরূপ সজ্জিত হইত, প্রধান কর্ম্মচারীদিগকেও সেইরূপ বেশ-ভূষার পারিপাট্য করিয়া গোবিন্দজীকে আনিতে যাইতে হইত। মহারাণীমাতার দেওয়ানরূপে পুনরায় পাঁচ-আনির সংসারে প্রবেশ করার পর আমার পিতৃদেবকে এই মাসিক সমারোহে অবশ্যই

যোগদান কয়িতে হইত, কিন্তু তিনি বেশের কোন পরিবর্ত্তন করিতেন না। একদিন চীলের ঘরের খড়খড়ি হইতে ইহা লক্ষ্য করিয়া মহারাণী অসন্তুষ্ট হন। শুনিয়া পিতাঠাকুরমহাশয় বলিয়া পাঠাইয়া ছিলেন যে, রাজার আমলে তিনি যেরূপ সজ্জা করিয়া তাঁর সঙ্গে বাহির হইতেন, এখন সেরূপ করিতে কষ্টবোধ করেন। শুনিয়া তাঁহার চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল, আর কখনও সে প্রসঙ্গ তুলিতেন না।

পোষ্যপুত্রের নাবালকি অবস্থায় কোন সমারোহ উপলক্ষে অথবা সম্ভ্রান্ত কোন লোক হাজিরা দিতে আসিলে মহারাণীমাতাকে কখন-কখন বাহিরের বৈঠকখানায় আসিতে হইত। তথায় স্বর্গীয় রাজাবাহাদুরের কর্ম্মচারিগণ পরিবেষ্টিত তৈলচিত্র লম্ববান ছিল। কদাচিৎ সে দিকে দৃষ্টি পড়িলে তাঁহার মুখ রক্তিম ও চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিত। এইজন্য সচরাচর তৈল চিত্রখানি বস্ত্রাবৃত করিয়া রাখা হইত।

প্রথমত স্বামীর আগ্রহে এবং পরে তাঁর পিতার যত্নে মহারাণীমাতা বেশ লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছিলেন। পিতৃদেবের মুখে শুনিয়াছি, কলিকাতায় শ্যামবাজারে অবস্থান সময়ে রাজার তাঁর প্রতি আদেশ ছিল, রাণীর কোন-কিছুর দরকার হইলে শ্লেটে তিনি লিখিয়া পাঠাইবেন এবং লেখায় ভুল থাকিলে সংশোধন করিয়া দিতে হইবে। এইরূপে তাঁর হস্তাক্ষর ও বর্ণ বিন্যাস দুরস্ত হইয়াছিল। তাঁহার ন্যায় সুন্দর সুস্পষ্ট হস্তাক্ষর সচরাচর দেখা যায় না। ইদানীং তাঁর হাতের লেখা কতকগুলি খাতা দেখিয়াছিলাম, তাহাতে ভাল ভাল পুস্তক হইতে নকল করিয়া তিনি হস্তাক্ষর-উন্নতির চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রতিদিন লিপি সমাপ্ত করিয়া যে তারিখ ও সময় লিখিয়া রাখিতেন, তাহাতে অধিকাংশ লেখা গভীর রাত্রে সম্পাদিত হইত জানা যায়।

প্রথম প্রথম পুঁটিয়ায় গিয়া দেখিতাম, জ্যোৎস্নারাত্রে ছাদে বসিয়া তিনি বাঙ্‌লা সাপ্তাহিক

কি মাসিক পত্র অথবা কোন পুস্তক চন্দ্রালোকে পাঠ করিতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে পার্শ্ববর্ত্তিনীদের নানা গল্প চলিত, কদাচিৎ মুখ তুলিয়া তিনি কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করিতেন। এইরূপ পড়ার অভ্যাস ৪।৫ বৎসর আমি নিজে দেখিয়াছি। আমি বিস্ময় প্রকাশ করিলে বলিতেন, এ তাঁর অনেককালের অভ্যাস, এমন কি, চন্দ্রালোকে সূচ সূতা পরাইতেও তিনি কষ্টবোধ করেন না। সংস্কৃত এবং বাঙ্‌লা গ্রন্থের তাঁহার যে সংগ্রহ ছিল, তাহা রাজধানীর কোন বৃহৎ পুস্তকালয়ের পক্ষেও গৌরবজনক। সংস্কৃত তিনি সামান্য বুঝিতেন, কিন্তু বাঙ্‌লায় উল্লেখযোগ্য কোন গ্রন্থ তাঁহার অপঠিত ছিল না। কোন নূতন গ্রন্থ প্রকাশ হইলে সংগ্রহ করিয়া উত্তমরূপে বাঁধাইয়া লওয়া ও গ্লাস্‌কেসে সাজাইয়া রাখা তাঁহার জীবনের একটী প্রধান আনন্দ ছিল। কলিকাতায় যখন কলেজে পড়ি, তখন একবার গ্রীষ্মের ছুটিতে পুঠিয়ায় আসিয়া বইগুলি আমি শৃঙ্খলার সহিত সাজাইয়া দিয়াছিলাম এবং একটি

তালিকাও প্রস্তুত করিয়াছিলাম। সে যাহা হউক, কৈশোরে মাতৃভাষার পুস্তকরাশির সংস্পর্শে এইরূপে আসিয়া আমি বাঙলাসাহিত্যের স্বাদ পাইয়াছিলাম। ভাল বই হাতে আসিলেই মাতা আমায় পড়িতে দিতেন এবং পাঠ সাঙ্গ হইলে মতামত জিজ্ঞাসা করিতেন। আমিও কবিতা লিখিয়া মাঝে মাঝে তাঁকে পড়িতে দিতাম। তাঁহার অনুমোদন ও উৎসাহ চিরদিন আমায় সাহিত্যা-লোচনায় অগ্রসর করিয়াছে।

২

মহারাণীমাতার সহিত আমার বাঙ্‌লা সাহিত্য ও ভাষা সম্বন্ধে সময়ে সময়ে অনেক কথাবার্ত্তা হইত। বাল্যকালে আমি পণ্ডিত-কৃষ্ণকমল-ভট্টাচার্য্য-সম্পাদিত "অবোধবন্ধু" নামক মাসিক পত্রের নিয়মিত পাঠক ছিলাম এবং ইহাতে প্রকাশিত পল্লীচিত্র এবং পিতৃবন্ধু কবিবর বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কবিতাগুলি আমার বড় ভাল লাগিত।

বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" এবং "বিবিধার্থসংগ্রহে"র পর "অবোধবন্ধু"র স্থান নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত। টেকচাঁদ ঠাকুরের গ্রাম্য-শব্দবহুল ভাষা বাঙ্‌লাকে অনুস্বরবিসর্গবিহীন সংস্কৃত পরিচ্ছদ হইতে অনেক পরিমাণে রক্ষা করিয়াছিল, ইহা অস্বীকার করিবার জো নাই। কিন্তু অবোধ-বন্ধুর প্রবন্ধাবলীতে যে খাঁটি সরস বাঙ্‌লার উন্মেষ দেখা দিত, বঙ্গদর্শনযুগে তাহার বিকাশ হইয়াছিল, ইহা সচরাচর কেন উক্ত হয় না, বলিতে পারি না। সে যাহা হউক, বঙ্গদর্শনের অভ্যুদয়ে যে ভাব ও ভাষাপ্রবাহ তখনকার শিক্ষিতসমাজকে আন্দোলিত করিয়াছিল, ১২৯৭সালে নিম্নস্তরের ছাত্র হইলেও আমরা তাহার প্রভাব অনুভব করিয়াছিলাম। সোম-প্রকাশের সম্পাদকীয় বক্তব্যে এবং পত্র প্রেরকদের স্তম্ভে বঙ্গদর্শনের প্রবর্ত্তিত ভাষার প্রতি যে সকল দোষারোপ হইত, আমি তাহা শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতাম না। আমার মতামত অকপটে আমি মাতৃসমীপে ব্যক্ত করিতাম।

কলিকাতায় আমাদের ছাত্রাবস্থায় একবার শীত-কালে মহারাণীমাতা গঙ্গাসাগরস্নানোপলক্ষে সেখানে গিয়া কয়মাস ছিলেন। কলের জল আদৌ তিনি ব্যবহার করিতেন না। সেজন্য কলিকাতাসহরের ভিতর বিস্তর লোকজন, বিশেষত তাঁহার আশ্রিতা ব্রহ্মচারিণী বিধবার দল লইয়া বেশীদিন বাস করা সম্ভব হয় নাই। কয়লাঘাটার গঙ্গাতীরে একটি বৃহৎ বাটি তাঁহার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। আমি পুটিয়া-অঞ্চলের কয়জন আত্মীয় ছাত্রসহ মাঝে মাঝে তাঁহাকে প্রণাম করিতে যাইতাম। নানাশ্রেণীর লোক সর্ব্বদা তাঁহার প্রবাসগৃহ সরগরম রাখিত। ইহার ভিতর দানপ্রার্থীর সংখ্যাই বিস্তর, বলা বাহুল্য। তাঁহার অধিকাংশ দান কোথাও সহজে সাধারণের গোচর হইতে পাইত না, কিন্তু কলি-কাতায় দেশহিতকর কার্য্যের নামে দানগ্রহণের এক অপূর্ব্ব কৌশল তাঁহাকে বিস্মিত করিয়াছিল। তিনি যদি দান করিতেন পাঁচশত, খবরের কাগজে উঠিত পনরশত এবং যদি প্রতিশ্রুত হইতেন হাজার, তিন

গুণের কথা নিনাদিত হইত। দানপ্রার্থীরা শেষে খবরের কাগজে প্রকাশিত অর্থটারই দাবি করিয়া বসিতেন। যে-কোন শ্রেণীর লোক কোন প্রার্থনা লইয়া কয়লাঘাটায় তাঁহার দ্বারস্থ হইত, তাহাকে রিক্তহস্তে ফিরিতে হইত না। কেহ গাড়িতে গেলে যাতায়াতের খরচ পর্য্যন্ত পাইত। গঙ্গাতীরে তিনি কাহারও কোন উপহার লইতে অসমর্থ, ইহা সম্ভবত না জানিয়া কোন কোন পদস্থ ব্যক্তি উপঢৌকন পাঠাইয়া তাঁহাকে বিলক্ষণ বিপদে ফেলিতেন। এদিকে তাহা লইলে গঙ্গাতীরে দানগ্রহণের প্রত্যবায় ভাগিনী হইতে হয়, অন্যদিকে তাঁহার কোন কার্য্যে কেহ মনে ক্লেশ না পান, ইহাও দেখিতে হইবে। শেষে আমলাদের কেহ সে-সব দ্রব্য সম্ভার গ্রহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ দুঃখীলোকদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিতেন; উপহারবাহক ও বাহিকার দল রাজসংসার হইতে প্রচুর পুরস্কার লাভ করিয়া ফিরিয়া যাইত। অবশ্য, ভিতরের কথা তাহারা বুঝিয়া না যাইত এমন নহে।

কলিকাতায় তাঁহার নিজের স্বাস্থ্য মন্দ ছিল না। কিন্তু গঙ্গাসাগরে স্নানের পর এবং তদুপলক্ষে নিয়মাতিরিক্ত কৃচ্ছ্র সাধন জন্য তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন। সেই যে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙিয়া গেল, আর কখন তাহা সম্পূর্ণ সারিল না। মুরশীদাবাদের বিখ্যাত কবিরাজ গঙ্গাধর সেন মহাশয় কয়মাস ধরিয়া তাঁহার চিকিৎসা করিয়াছিলেন। আমরা সে-বার গ্রীষ্মাবকাশের সময় গিয়া দেখি, কবিরাজ-প্রবর বেশ আসর জম্‌কাইয়া বসিয়াছেন, রাজবাটীতে ঔষধপ্রস্তুতের ধুম পড়িয়া গিয়াছে। লোকে বলিত, তাঁর তেমন হাতযশ ছিল না। পাণ্ডিত্যে তিনি দিগ্বিজয়ী ছিলেন, সর্ব্বশাস্ত্রে তাঁহার দৃষ্টি ছিল। পড়াশুনার অভ্যাস প্রবীণবয়সেও তাঁহার যেরূপ ছিল, মনে করিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। তাঁহার স্পষ্টবাদিতা এবং চরিত্রের স্বাধীনতা দেশের সর্ব্বত্র পরিচিত ছিল। অল্পদিনের ভিতর পুটিয়াতেও সে পরিচয়ের অভাব হয় নাই। রাজবাটীর কোন কোন সরিকের রাজারা ভদ্রলোককে "আপনি" বলিতে

জানিতেন না। কবিরাজ মহাশয় দেখা করিতে গিয়াছেন, তিনি দেশ বিখ্যাত চিকিৎসক এবং লোক সোজা নন, তাঁহাকে "তুমি" বলা যায়না, কিন্তু "আপনি"ই বা বলা হয় কিরূপে? রাজা কৌশলে আলাপ করিতে লাগিলেন, কর্ত্তা উহ্য রাখিয়া কেবল কর্ম্ম ও ক্রিয়ার গ্রন্থিবন্ধন! নমুনা এইরূপঃ—"কবিরাজের কবে আসা হইয়াছে?" 'কোথায় বাসা লওয়া হইল?" ইত্যাদি। রাজ-কৌশলটা বুঝিতে অবশ্য কবিরাজের বেশীক্ষণ লাগিল না। হাসিয়া তিনি বলিলেন, "হুজুরের অত কষ্ট করার দরকার নাই। আমায় না হয় 'তুমি'ই বলুন!" তাঁহার চিকিৎসায় মহারাণীমাতার কিছু উপকার হইলে কবিরাজমহাশয় তাঁহার একজন সুশিক্ষিত ছাত্রকে রাখিয়া পুটিয়া ত্যাগ করিলেন। একজন ডাক্তারের সহিত পরামর্শ করিয়া শেষে তিনিই ঔষধ পত্র দিতেন। এই চিকিৎসকেরা মহা-রাণীমাতার বেতনভুক্ হইলেও, পুরস্কার ছাড়া, বাহি-রের কোন লোকের সামান্য চিকিৎসার প্রয়োজনে

তিনি তাঁহাদের পৃথক্ "দর্শনী"র ব্যবস্থা করিতেন। এক দিন দেখি, বেলা ৯টার আমলে একটি ব্রাহ্মণ-কন্যা কোন দরিদ্র পরিবারের খবর লইয়া আসিলেন —কাহারও জ্বর হইয়াছে, চিকিৎসা হইতেছে না। মাতা সাগু-মিছরি প্রভৃতি রোগীর পথ্য তৎক্ষণাৎ পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া কয়টি টাকা ব্রাহ্মণকন্যাকে আনাইয়া দিলেন এবং গোপনে উপদেশ করিলেন রাজবাটীর চিকিৎসকদের লইয়া-গিয়া যেন "ভিজিট্" দেওয়া হয়। এইরূপ বিবেচনার সহিত তিনি আপনা হইতে সকলের ন্যায্য প্রাপ্য বণ্টন করিয়া দিতেন। কিন্তু কেবল দরিদ্র পরিবারের জন্যইএ ব্যবস্থা নহে! সম্পন্ন মধ্যশ্রেণীর ভদ্রলোকেদেরও এই ভাবে তিনি কত সাহায্য করিতেন। রাজবাটির অন্যান্য সরিকের গৃহে ও তাঁহার মহত্ত্বের,—স্নেহশীল হৃদয়ের স্নিগ্ধরশ্মি সর্ব্বদা বিকীর্ণ হইত।

৩

আমাদের বাল্য ও কৈশোরকালে পুটিয়াসমাজে যে

গোঁড়া হিন্দুয়ানির আদর্শ দেখিতে পাইতাম, বঙ্গ-দেশের কোন স্থানে আজিকার দিনে তাহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। ছাত্রজীবনের প্রথমভাগে যে কঠোর নিয়ম আহারাদিসম্বন্ধে মানিয়া চলিতে আমরা অভ্যস্ত হইয়াছিলাম, কলিকাতার "মেসে" থাকিতে থাকিতে তাহার কতক-কতক শিথিল হইয়া গেল। এই সম্বন্ধে একটি গল্প মনে পড়িতেছে। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিদায়গ্রহণের পর পুটিয়ায় যখন ছিলাম, একদিন দশটার আমলে মহারাণীমাতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অন্দরের বাহিরে আসিয়াছি, সম্মুখে দেখি, দ্বিতল বৈঠকখানার মুক্ত বাতায়নে দাঁড়াইয়া রাজকুমার। ইনি মহারাণীর পোষ্য-পুত্র, আমাদের চেয়ে বয়সে কিছু ছোট, তখনও বয়ঃপ্রাপ্ত হন নাই। আমায় দেখিয়া কুমার বলিলেন "শ্রীশদাদা, রোজ মাকে দেখিয়া চলিয়া যান, আমার কাছে আসেন না। আজ এইখানে আহার করতে হবে।" বাসায় একটু প্রয়োজন ছিল, বিশেষ কুমারবাহাদুরের মধ্যাহ্নকৃত্য কিছু বিলম্বে ঘটিয়া থাকে

জানিয়া স্নানাদির পর প্রায় ১২টার সময় রাজবাটীতে ফিরিয়া গেলাম। আহারাদির পর কুমারের সঙ্গে গল্প করিতে করিতে বেলা পড়িয়া আসিল। তখন মাতার হবিষ্যান্নগ্রহণ শেষ হইয়াছে সংবাদ লইয়া অন্দরে গেলাম। দেখি, তিনি বসিবার ঘরে অনাবৃত হর্ম্ম্যতলে (যেমন সচরাচর বসিতেন), কতকগুলি-ব্রাহ্মণবিধবাপরিবৃত হইয়া বসিয়া আছেন। নিজে কোন আসন গ্রহণ করিতেন না, কিন্তু আমরা প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেই দাসীদের প্রতি আদেশ হইত, "বসিতে দাও।" ছেলেবেলা হইতে ইহাই নিয়ম দেখিতাম। আমি অবশ্য চিরদিনই আসন সরাইয়া বসিয়া পড়িতাম। মা আজ প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজত তোমার আহারের বড় কষ্ট হয়েচে ?" "কেন ?" "শুন্‌লাম খোকার ওখানে আজ তোমার নিমন্ত্রণ ছিল।...আমি একবার মনে কর্‌লাম যে, তরকারী পাঠাইয়া দিই। কিন্তু খোকা কি ভাবিবে বলিয়া পাঠাইলাম না। ওখানে পেঁয়াজের রান্না হয়, তুমিত খাবে না !"

আমি চুপ করিয়া গেলে মাতৃসমীপে কৈশোরের সেই নিষ্ঠাচারিরূপে পরিচিত থাকিতাম, কিন্তু ইহা আমার অসহ্য বোধ হইল। চক্ষু নত করিয়া বলিলাম—"এখন পেঁয়াজ খাই, কলিকাতার মেসে থাকিয়া শিখিতে হয়েচে!" ব্রাহ্মণবিধবার দল এক-যোগে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন মা অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন—"ও ছেলে ত মিছা বলিবে না!"

আধুনিক ইংরেজীনবিশদের সর্ব্ববিষয়িণী উচ্ছৃঙ্খলতা তিনি অবশ্য শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন না; কিন্তু কতকগুলি বিষয়ে তাঁহাদের প্রশংসা করিতেন। সাধারণত শিক্ষিতদলের সত্যপ্রিয়তা এবং উৎকোচ গ্রহণে বিরাগ সেকালের লোকের অনুকরণীয়, ইহা একাধিকবার তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি। পুলিসবিভাগে সৎলোকের কথা শুনিলে তিনি তাঁহাকে সম্মানিত করিয়া উৎসাহ দিতেন। বিশেষভাবে একজন পুলিস সব্-ইন্স্পেক্টরের কথা এখানে উল্লেখযোগ্য। ইনি প্রায় সমগ্র চাকরীর কাল রাজশাহীর নানাস্থানে কাটাইয়াছিলেন এবং

পুটিয়ায় দীর্ঘকাল ছিলেন। সেখানে ভিন্ন ভিন্ন সরিকদের স্বার্থের ঘাতপ্রতিঘাতে অবিশ্রান্ত যে বিবাদাগ্নি জ্বলিত, দারোগা কেবল নিজের চরিত্রবলে তাহা থামাইয়া রাখিতেন। এই সজ্জন অথচ কঠোর কর্ত্তব্যপরায়ণ পুলিসকর্ম্মচারীকে চিরদিন মহারাণী-মাতা সম্মান ও শ্রদ্ধা করিতেন।

প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মে তিনি অনন্ত বিশ্বাসবতী ছিলেন এবং তাহার সকল অনুষ্ঠান পরম নিষ্ঠার সহিত তাঁহার রাজসংসারে ও পিতৃগৃহে আচরিত হইত। ফলত পিত্রালয়ে পিতামহী ও পিতাঠাকুরের কাছে শৈশবে ভক্তিভাবের যে শিক্ষা তিনি পাইয়াছিলেন, কালে তাহাই পূর্ণতালাভ করিয়াছিল। তাঁহাদের দর্শন আমার অদৃষ্টে ঘটে নাই, কিন্তু মহারাণীমাতার মাতৃদেবীর যে পবিত্রতা, সহিষ্ণুতা ও করুণার ছবি বাল্যকাল হইতে আমি দেখিয়াছি, তাহাতে নিত্য মনে হইয়াছে, মাতাই তাঁর সকল মহত্ত্বের মূল। বাল্যে মহারাণী হাঁস ও পায়রা পুষিতে বড় ভালবাসিতেন বটে, কিন্তু ফুল ও ঠাকুর-

পূজাই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় খেলা ছিল। এক-দিন পিতা তাঁহার নিত্য-দেবার্চ্চনা শেষ করিয়া উঠিয়া গিয়াছেন, এমন সময়ে বালিকা ক্রীড়াচ্ছলে সেখানে পূজায় বসিলেন। কিন্তু আসনের নিকট প্রদীপ জ্বলিতেছিল, তাহা তাঁহার লক্ষ্য হয় নাই। পরিধানের বস্ত্রাঞ্চল দীপশিখায় পড়িয়া ধু ধু করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। কোন কোলাহল কি চাঞ্চল্য প্রকাশ না করিয়া সে বস্ত্র তিনি তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করিলেন এবং নির্ম্মাল্যের জলে ডুবাইয়া ধরিলেন। পরে আগুন নিবিলে ভিজা কাপড় পরিয়া পিতামাতার নিকটে গিয়া বলিলেন, "এমন সুন্দর কাপড়খানা পুড়ে গেল!"

বালবিধবা মহারাণীমাতা, পরজন্মে আর বৈধব্য ঘটিবে না, হিন্দুমহিলাদের এই বিশ্বাসমত প্রতিবৎসর সমারোহের সহিত জগদ্ধাত্রীপূজা করিতেন। সেজন্য 'জগদ্ধাত্রীপূজার বাড়ী' নাম দিয়া রাজবাটীর অনতি-দূরে তিনি একখানি মাটীর বাড়ী প্রস্তুত করাইয়া-ছিলেন এবং পূজা উপলক্ষ্যে কয়দিন আত্মীয় ও

আশ্রিতগণ সহ সেখানে বাস করিতেন। মনে পড়িতেছে, সেই সময়ে সে গৃহে শ্বেতকৌশিকবস্ত্র-পরিহিতা তাঁহার গৌরাঙ্গী সুদীর্ঘ মাতৃমূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে কতবার আমাদের মনে মনে হইয়াছে, এই ত জীবন্ত জগদ্ধাত্রীমূর্ত্তি! আবার পৃথক্ পূজা কেন?

এই সকল পূজা এবং ব্রতাদি উপলক্ষে তিনি যে কঠোর সংযম অবলম্বন করিতেন, উত্তরকালে সম্ভবত তাহাই তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গের অন্যতম কারণ। উপর্য্যুপরি ৩৪টা নির্জ্জলা উপবাস বৎসরের মধ্যে কতবার তিনি করিতেন এবং তাহাতে এরূপ অভ্যস্ত ছিলেন যে, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। একদিন বর্ষার শেষদিকে আমরা সকলে তাঁহার কাছে বসিয়া আছি, এমন সময়ে খবর আসিল যে, পুরোহিতঠাকুর আসিয়াছেন। মহারাণীমাতা খুব মৃদুস্বরে কথা কহিতে লাগিলেন এবং দাসদাসীদের দ্বারা পুরোহিতকে জানাইলেন, তাঁহার ইচ্ছা, ধারাষ্টমীর ব্রত গ্রহণ করেন। পুরহিতঠাকুর মাতার পীড়া ও শারীরিক দৌর্ব্বল্যের উল্লেখ করিয়া বারণ করিলেন, কিন্তু

মহারাণী বলাইলেন, এক-আধটা উপবাস উপবাসই নহে, অতএব সে ব্রত তিনি গ্রহণ করিবেন। সহাস্য মুখে আমাদের সমক্ষে বারংবার হাতজোড় করিলেন; অন্নদাদাসী প্রকোষ্ঠান্তরে উপবিষ্ট পুরোহিতঠাকুরকে সে কথা জানাইলেন। তিনি বলিলেন, নিজের শরীর-সম্বন্ধে এরূপ ছেলেমানুষী করা মার কর্ত্তব্য হয় না। যাহা হউক, পুরোহিত আর আপত্তি করিলেন না।

মা, সচরাচর সোনারূপা নিজে স্পর্শ করিতেন না, কেবল গুরুকুলের কেহ আসিলে প্রণামী দিবার সময় টাকা হাতে করিতেন দেখিতাম। তখন গলবস্ত্রে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেন। একদিন শ্রীবৃন্দাবন-ধাম হইতে তাঁহার গুরুপত্নী কিছু টাকা চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন। টাকা সেইদিনই পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হইল। সেদিন নানা অসুবিধা, পরদিন পাঠাইলেই ভাল হয়, কিন্তু মা তাহা শুনিলেন না। বলিলেন, "গুরুর আজ্ঞা, আজই পাঠাইতে হইবে।" একদিন তাঁহার আশ্রিত আমাদের এক আত্মীয় মহারাণীমাতাকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, তাঁর গুরু-

দেব আসিয়াছেন, মন্ত্র দিতে চাহিতেছেন, মন্ত্র লওয়া কর্ত্তব্য কি না? মা বলিলেন, "গুরু নিজে আদেশ করিলে কালাকাল নাই।"

৪

মহারাণীমাতা জীবিতমানে তাঁহার কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের কথা কাহিনীর মত বঙ্গসমাজের সর্ব্বত্র কীর্ত্তিত হইত, এবং অদ্যাপি হইয়া থাকে। কিন্তু কয়বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার এক জীবনীলেখক তদীয় প্রাত্যহিক কার্য্যের বিবরণী দিতে গিয়া "হবিষ্যান্ন"সম্বন্ধে যে উপন্যাস লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহার কোন মূল নাই। তিনি "সাম্যধর্ম্মপ্রবণতায়" আশ্রিতা বিধবাদের সঙ্গে এক পংক্তিতে "একখানা কদলীপত্র লইয়া দরিদ্রার মত উপবেশন করিয়া" ভোজন করিতেন, লেখকের এই চিত্র তাহার সম্পূর্ণ মনঃকল্পিত। অশন বসনসম্বন্ধে তপস্বিনীর সংযম পূর্ণমাত্রায় আচরিত হইত বটে, কিন্তু রাজোচিত মহিমা ও মর্য্যাদা তাঁহার সর্ব্ব কার্য্যে ও ব্যবহারে প্রতিফলিত হইত।

তাঁহার "আহ্নিকের থাল" যে স্বচক্ষে না দেখিয়াছে, তাহাকে বুঝান শক্ত, কিরূপ ষোড়শোপচারে এবং মহার্ঘ খাদ্যদ্রব্যসম্ভারে দৈনিক দীর্ঘকালব্যাপী দেবার্চ্চনা তিনি সম্পন্ন করিতেন। ঐ আহ্নিকের থাল পূজাশেষে পুটিয়াবাসী কোন-না-কোন গৃহস্থবাটীতে অথবা সমাগত অতিথি-অভ্যাগতের নিকট প্রেরিত হইত,—নিজের ও অপর সরিকদের আমলাদের কাছেও পাঠান বাদ যাইত না। তাঁহার হবিষ্যান্ন সচরাচর তাঁর মাতুলানীঠাকুরাণী প্রস্তুত করিতেন, কখন-কখন ও-বাড়ী (পিত্রালয়) হইতে জেঠাই-মাতা আসিয়া পাক করিয়া দিতেন। ইঁহারা কেহ না থাকিলে স্বয়ং রন্ধন করিয়া লইতেন। ১২৮৯ সালের আশ্বিনমাসের দৈনন্দিন লিপি পড়িয়া দেখিতেছি, মাতা যখন অতিশয় অসুস্থ, তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠতাতপত্নী উপর্য্যুপরি দুইদিন আসার পর তৃতীয় দিনে তিনি বলিতেছেন যে, কাল আর তাঁকে আসিতে হইবে না, কাল ব্রত, নিজেই আলুনি পাক করিয়া লইবেন। ফলত এসকল ব্যাপারে সুস্থ

শরীরে যেরূপ কঠোর সংযম তিনি আচরণ করিতেন, পীড়াদির সময়ও তাহার অন্যথা হইত না।

পূজার্চ্চনায় শাস্ত্রসম্মত সর্ব্ববিধ বিশুদ্ধির দিকে তিনি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন, নিজে পঞ্জিকা দেখিয়া প্রত্যহ সন্ধ্যাবন্দনাদি করিতেন এবং পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণ অশুদ্ধ না হয়, তাহার ব্যবস্থায় কখন অমনোযোগী হইতেন না। আমার সমক্ষে একদিন শ্রীযুত কুঞ্জ ভাদুড়ীকে বলিলেন যে, ভট্টাচার্য্যমহাশয়কে বলিও ত যে, পূজা প্রভৃতি যেন ভাল করিয়া শিক্ষা করেন। ঐদিন গল্প করিয়াছিলেন, তাঁহার পিতৃদেবের জীবিতকালে একদিন শ্রাদ্ধোপলক্ষে তিনি মাতাকে বলিয়াছিলেন—"পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণ শুদ্ধ হয় না। তুমিত তাহার সঙ্গে কথা কও না। গিরিসিদ্ধান্ত তোমায় পুনরায় মন্ত্র বলাইবে, তখন তুমি বলিও।" তান্ত্রিক মতের মদ্যপানাদির অনুশাসন মহারাণীমাতা শ্রদ্ধেয় মনে করিতেন না। একদিন তীব্র বিদ্রূপ করিয়া ঐ মতকে "সুধা-সিন্ধু" বলিয়াছিলেন।

হিন্দুস্থানের প্রায় সমস্ত তীর্থস্থান তিনি দর্শন করিয়াছিলেন। প্রত্যেক তীর্থে গিয়া তাহার নামে একএকটি ফল ত্যাগ করিতেন। তাঁহার নিজমুখে পরিত্যক্ত ফলের একটি তালিকা আমি একবার সংগ্রহ করিয়াছিলাম।

নিজের ধর্ম্মবিশ্বাস কঠোর হিন্দুয়ানিসম্মত হইলেও তাঁহার মত সধারণত বড় উদার ছিল। এদেশের সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের খবরাখবর লইতেন এবং উপাসনাগৃহাদিনির্ম্মাণ জন্য সাহায্যপ্রার্থনা করিলে কহাকেও তিনি বিমুখ করিতেন না। ত্রিশ-বৎসর পূর্ব্বে পুটিয়ার ন্যায় হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে কেহ গেলে তাঁহার দাঁড়াইবার স্থান না হওয়ার কথা। কিন্তু মহারাণীমাতা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের একজন প্রচারককে রাজবাটীতে উপাসনাদি করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন এবং নিমন্ত্রণ করিয়া অতিশয় যত্নের সহিত তাঁহাকে আহারাদি করাইয়াছিলেন। প্রচারকমহাশয় নিরামিশভোজী জানিয়া স্বহস্তে তিনি কয়টি তরকারী

প্রস্তুত করিয়াছিলেন। জয়পুরী (সম্মোহরের) শ্বেত-প্রস্তরের থালা ও তাহারই শতাধিক পাত্রে অভ্যাগত অতিথিমহাশয়ের জন্য ভোজনগৃহের অর্দ্ধেক স্থান সেদিন পূর্ণ হইয়াছিল, দীর্ঘকাল পরে তাহা আমার মনে পড়িতেছে। তিনি নিজহস্তে পাত্র-গুলির নাগাল পাইতেছিলেন না। পাচক ব্রাহ্মণগণ তাহা ক্রমশ অগ্রসর করিয়া দিতেছিল। মহারাণী-মাতার অতিথিসৎকার জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে এই-রূপেই সচরাচর সম্পন্ন হইত।

এক দিকে স্বধর্ম্মে প্রগাঢ় নিষ্ঠার জন্য তিনি যেমন হিন্দুসমাজের আদর্শ ছিলেন, অপর পক্ষে তাঁহার মহৎ চরিত্র ও উদারতার দরুণ অপরাপর সম্প্রদায়ের লোকেরাও তেম্‌নি অকপট শ্রদ্ধার অর্ঘ্য তাঁহাকে অর্পণ করিতেন। বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া কন্যানির্ব্বিশেষে তাঁহাকে স্নেহ করিতেন। ভূদেববাবু যতদিন রাজশাহীর স্কুল-ইন্‌স্পেক্টের ছিলেন, মধ্যে মধ্যে পুটিয়ায় গিয়া

মহারাণীমাতার সংবাদ লইতেন এবং স্বর্গীয় রাজার তৈলচিত্র দেখিয়া উচ্ছ্বাসভরে একবার এডুকেশন গেজেটের স্তম্ভে নিজে যে কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে মহারাণীর প্রতি তাঁর ভক্তি ও স্নেহ পরিস্ফুট হইয়াছিল। রাজশাহী হইতে বদলী হওয়ার সময় তিনি স্বহস্তে মাতাকে "তুমি" সম্বোধন করিয়া চিঠি লিখিয়া আসেন। তাহাতে তিনি পরম আপ্যায়িত হইয়া বলিয়াছিলেন, পিতৃস্নেহসূচক এই "তুমি" তাঁর বড় মিষ্ট লাগিয়াছে। ১২৮৯ সালে শীতকালের শেষে তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙিয়া গেলে কাশীধামে তাঁহাকে লইয়া যাওয়ার ব্যবস্থা হইল। মহারাণীমাতা ও লোকজনদের কয়দিন পূর্ব্বে রওনা করিয়া কুমার স্বয়ং পশ্চাতে আসিতেছিলেন। পূর্ব্বাহ্ণে সংবাদ পাইয়া আমরা কলিকাতা হইতে মাতৃদর্শন জন্য চুঁচুড়ার জোড়াঘাটে উপস্থিত হইলাম। বেনারস পর্য্যন্ত স্পেশেল ট্রেণের বন্দোবস্ত করিতে ২।৩ দিন অতিবাহিত হইল। তাঁহার সেবারকার শীর্ণ-জীর্ণ মূর্ত্তি দেখিয়া আমি বড়

ম্রিয়মাণ হইলাম এবং বুঝিলাম যে, বেনারসে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা হইলেও রক্ষা পাওয়া কঠিন। কলিকাতার প্রসিদ্ধ ভিষক্‌মণ্ডলীকে দেখাইয়া কিছুদিন চিকিৎসার পর তাঁহাকে কাশী লইয়া যাওয়া হউক, আমার এই প্রস্তাব রাজকর্ম্মচারীদের ভাল লাগিল না। ভূদেববাবু তখন পেন্‌শেন্‌ লইয়া বাটীতেই ছিলেন, আমার মুখে সকল কথা শুনিয়া তিনি মহারাণীমাতার সংবাদ লইতে আসিলেন। তাঁহার বিশ্বস্ত রাজকৃষ্ণবাবুকে আনাইয়া তিনি মাতার নাড়ী পরীক্ষা করাইলেন এবং কিছুদিনের জন্য সেখানে রাখিয়া চিকিৎসার পরই যে বেনারস যাওয়া বিধেয়, ইহা সকলকে বুঝাইয়া দিলেন। সমভিব্যাহারী রাজকর্ম্মচারীরা এই পরামর্শানুসারে কার্য্যারম্ভ করিবার পূর্ব্বেই কুমার সদলবলে পুটিয়া হইতে আসিয়া পৌঁছিলেন; এবং বরাবর কাশীধামে যাওয়ার প্রস্তাবই বাহাল রহিল। আমার পিতৃদেব তখন রাজসংসার হইতে পেন্‌শেন্‌ লইয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ভূদেববাবু কুমারকে বলিবার জন্য তাঁহাকে বলিলেন যে, তাঁর যে মা, তিনি সমস্ত দেশের মাতৃস্বরূপা, সুচিকিৎসার অভাবে অকালে কোন দুর্ঘটনা ঘটিলে তাঁহার কলঙ্কের সীমা থাকিবে না। এখানে বলা আবশ্যক, সে-যাত্রা মহারাণীমাতা আরোগ্যলাভ করেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই হঠাৎ কুমারের কাশীলাভ হওয়ায় তিনি দারুণ শোক পাইয়াছিলেন।

প্রধানত দানাদিসম্বন্ধে স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর-মহাশয়ের সহিত মহারাণীমাতার পত্রব্যবহার চলিত। সদনুষ্ঠানপ্রিয়তার জন্য বিদ্যাসাগর-মহাশয়কে তিনি বড় ভক্তি করিতেন এবং বলিতেন, তাঁহার প্রবর্ত্তিত বিধবাবিবাহ চলিলে সমাজে পাপস্রোত অনেক কমিবে। নিজের একটা প্রয়োজনে আমি একবার মহারাণীমাতার পত্র লইয়া বিদ্যাসাগরমহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিতপ্রবর কথায়-কথায় আমার শিক্ষাগুরু পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয়ের

সমক্ষে আমাদিগকে বলিলেন, "কথাটা তোমাদের বেশী মনে হইবে, কিন্তু ইহা সত্য যে, শরৎ-সুন্দরীকে আমি নিজের কন্যাদের চেয়ে বেশী স্নেহ করি।" মহারাণীমাতার যে পীড়ার কথা বলিতে-ছিলাম, তাহার সংবাদ পাইয়া বিদ্যাসাগর বালকের ন্যায় রোদন করিতে করিতে তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিয়াছেন, চুঁচুড়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করার পর তদীয় জামাতা সূর্য্যবাবুর মুখে ইহা আমি শুনিয়া-ছিলাম।

ব্রাহ্মসমাজের স্বর্গীয় বাবু কালিনাথ দে রাজ-শাহী জেলাস্কুলের যখন শিক্ষকতা করিতেন, তখন হইতে শেষ পর্য্যন্ত তিনি মহারাণীর সাধুদৃষ্টান্তের একজন পরম অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন। ১২৮৮ সালে তিনি যখন কাঁথির ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্, তখন মাতা বিষয়-আশয়ের ভার কুমারের হস্তে দিয়া কাশী যাইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন শুনিয়া লিখিয়াছিলেন, "আপনাকে বলা বাহুল্য যে, চিত্তকে পরিশুদ্ধ রাখিলে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই তীর্থস্থান।

'কাজ কিরে মোর কাশী,
ঘরে বসে দেখ্‌বো আমি গয়া, গঙ্গা, বারাণসী।
আমার কালীর পদ কোকোনদ তীর্থ রাশি রাশি॥'

আমার সহধর্ম্মিণী এই গান বলিয়া দিলেন, তাই লিখিলাম।"

আত্মীয়, অনুগত এবং পুত্রস্থানীয় যে সকল পুরুষের সমক্ষে তিনি বাহির হইতেন, নিঃসঙ্কোচে তাঁহাদের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতেন। কিন্তু তাঁহার সহজ নম্রতা ও লজ্জাশীলতা প্রত্যেক কথায় ও কার্য্যে বিকশিত হইয়া উঠিত। শৈলেশচন্দ্র যখন নিতান্ত বালক, গরিব সহপাঠীদের বই, স্কুলের বেতন ও অন্যান্য সাহায্যের জন্য মহারাণীমাতাকে মাঝে মাঝে ধরিয়া বসিতেন। একদিন তিনি তাঁর এক দীর্ঘাকৃতি সতীর্থ সঙ্গে অন্দরের মধ্যে উপস্থিত। সে ছেলেটি আর কখন রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করে নাই এবং শৈলেশের সঙ্গে বলিয়াই যাইতে পারিয়াছিল। আমি দেখিলাম, মা হঠাৎ মাথার কাপড় টানিয়া দিলেন এবং শৈলেশকে

কাছে ডাকিয়া তাহার আবদারটা সসঙ্কোচে মৃদুস্বরে প্রশ্ন করিয়া জানিয়া লইলেন। শেষে শৈলেশচন্দ্র কার্য্যোদ্ধার করিয়া সঙ্গীসহ চলিয়া গেলে, ব্যাপারটা কি, বুঝিলাম। আর এক দিনের কথা। প্রাতে আমরা তাঁহার কাছে বসিয়া আছি, এমন সময় সংবাদ আসিল, দেওয়ানজী হাজিরা দিতে আসিতেছেন। গৃহান্তরে বসিয়া অন্যান্য কথার পর পিতৃদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, ময়মনসিংহের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ রাখালবাবু শেষে যে পুস্তক পাঠাইয়াছিলেন, তাহা মা পাইয়াছেন কি না? উত্তর—পাইয়াছি। প্রশ্ন—রাখালবাবু জানিতে চাহিয়াছেন, মহারাণীমা পড়িয়া কি মত দেন। মা কিছু উত্তর করিলেন না, কেবল লজ্জায় আরক্তিম হইয়া মৃদু হাস্য করিলেন।

৫

"যেই মাতৃভাব রূপে দেখাবার তরে
লভেছিলি জনম ধরায়;

সে বিশ্ববাৎসল্য, সেই আত্মবলিদান
আজো তোর অরূপ প্রভায়!"

মহারাণীমাতার স্বর্গারোহণের বৎসর শরৎকালে—সে আজ প্রায় বিশবছরের কথা—স্বপ্নে তাঁহার অপরূপ মূর্ত্তি দর্শন করার পর এই কবিতা রচিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহা কেবলমাত্র উচ্ছ্বাসময় কল্পনা নহে। যে মাতৃভাবের পূর্ণবিকাশেই স্ত্রীচরিত্রের প্রকৃত গৌরব, বিধাতা অমিতহস্তে তাহা তাঁহাকে দান করিয়াছিলেন। তাহার যথাযথ চিত্র অঙ্কন করিতে "বিশ্ববাৎসল্য" কথাটির মত উপযোগী শব্দ আর নাই। কেননা, তাঁহার মাতৃস্নেহ মনুষ্যেতর জীবেও প্রসারিত হইত। বাল্যকালে দেখিয়াছি, ছাদে বসিয়া অপরাহ্নে তিনি গল্প অথবা লেখাপড়ার কাজ করিতেছেন, বন্যপারাবত তাঁহার অতি সন্নিকটে নির্ভয়ে চরিয়া বেড়াইতেছে। পক্ষিজাতিকে দেখিলেই করতলস্থ করার যে বালস্বভাবসুলভ লোভ, তাহা তখনও আমি সম্পূর্ণ পরিহার করিতে পারি নাই, অতএব এই দৃশ্যটি বড় বিস্ময়কর

মনে হইত। রাজবাটীর উত্তরদিকের প্রাচীন পরিখাটিকে সংস্কৃত করাইয়া তিনি যে সুদীর্ঘ চৌকী বা জলাশয় খনন করাইয়াছিলেন, তাহাতে কিছু-দিনমধ্যে বিস্তর শুক্তি জন্মিয়াছিল। মুক্তা-ব্যবসায়ীরা জানিতে পারিয়া প্রচুর লাভের আশায় দেওয়ানজির নিকট আবেন করিল, তাহারা বেশী হার দিতে প্রস্তুত, ঝিনুক উঠাইয়া লইবার আদেশ তাহাদিগকে দেওয়া হউক। প্রধান কর্ম্মচারীরা ইহাতে কোন ক্ষতি দেখিতেছিলেন না, বরং রাজ-সংসারের একটা নূতন আয়ের পথ খুলিতেছে বলিয়া খুসী হইয়াছিলেন। কিন্তু মহারাণী সচরাচর তাঁহা-দের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে অভ্যস্ত না হইলেও এক্ষেত্রে দৃঢ়তার সহিত আপন অসম্মতি প্রকাশ করিলেন এবং পিতৃদেবকে অনুযোগ করিয়া পাঠাইলেন যে, ছেলেপুলের বাপ হইয়া এরূপ নিষ্ঠুর প্রস্তাবের তিনি অনুমোদন করিয়াছেন! প্রাচীন রাজবাটীর চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী গড়খাই এক্ষণে বিভিন্ন সরিকদের চৌকীতে পরিণত হইয়াছে,

নানাজাতি জলচর পক্ষীরা এই সময়ে তাহাতে বিচরণ করিতে আসিত। রাজকুমার এবং তাঁহার সহচরেরা শিকারে অভ্যস্ত হইবার উদ্দেশে ইদানীং বন্দুকসহায়ে বহুদিনের আশ্রিত পাখীগুলিকে দুই-একবার উত্যক্ত করিয়াছিলেন। দুইচারিটা বন্দুকের আওয়াজ হইবামাত্র কথাটা মহারাণীর গোচর হইল এবং তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া কুমারকে নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন। হবিষ্যান্নগ্রহণের পর হাতমুখ ধুইবার জন্য তিনি খিড়কীর ঘাটে গমন করেন শুনিয়া আমি একদিন কৌতূহলী হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। মা হাসিয়া বলিলেন "একটা মাছ ভাত খাইতে আসে, তাই দেখিতে যাই।"

প্রায়শ দেখা যায়, সন্তানবতী না হইলে মহিলারা শিশুসন্তানদের অবারিত ঘনিষ্ঠতা সহিতে পারেন না। বিশেষত নিষ্ঠাবতী বালবিধবা হইলে ত কথাই নাই। মহারাণী ইহার ব্যতিক্রমস্থল ছিলেন। তাঁহার আদরযত্ন পাইয়া বালকবালিকারা তাঁহাকে ছাড়িতে চাহিত না, তিনিও তাহাদের সঙ্গে শিশু

হইয়া যাইতেন। একদিন তিনি রাণীঠাকুরাণীর সহিত সাক্ষাৎ জন্য চারি-আনির রাজবাড়ী গিয়াছিলেন। পরদিন গল্প করিলেন, "সেখানে বড় রাজকন্যার ছোট ছেলেটি পেঁয়াজ খাইয়া আসিয়া তাঁহার মুখে হা দিতে লাগিল। যতক্ষণ 'বড় গন্ধ' বলিয়াছিলাম, ততক্ষণ ঐরূপ করিয়াছিল, শেষে যখন বলিলাম গন্ধ নাই (অথচ গন্ধ ছিল) তখন আর দিল না।" তাঁহার ভগিনী পূজনীয়া শ্রীসুন্দরী দেবীর জ্যেষ্ঠা কন্যাটি যখন নিতান্ত শিশু, তখন একদিন ছোটবাড়ীর কোকনের (রাজকুমারীর পুত্র, ডাকনাম কুকুর) কি জিনিষ লইয়াছিল। মা আমার সমক্ষে তাহাকে বলিলেন, "বুঝিয়াছ, পরের জিনিষ লইতে নাই। তুমি কুকুরের জিনিষে হাত দিলে কেন?" শিশু রাগিয়া গেল, ঠোঁট ফুলাইয়া নিজের হাতের বালা খুলিয়া মহারাণীর গায়ে ফেলিয়া দিল এবং বলিল, "আর তোর কাছে আস্‌বো না। বাড়ীতে আমার যত অলঙ্কার আছে, গায়ে দিয়ে আস্‌বো না। চার-

আনির বাড়ীর ভালবাসা!" মার ন্যায় আমিও বুঝিলাম যে, সেদিন চারি-আনির বাড়ী গিয়া তিনি যে বালিকার সাম্‌নে সেখানকার শিশুদের অত্যন্ত আদর করিয়াছিলেন, তাহার প্রাপ্য স্নেহ ও সোহাগ পরের ছেলেদের অর্পণ করিয়াছিলেন, ইহাতে তাহার হিংসা হইয়াছিল। সহ্য করিতে না পারিয়া রাগে আজ সেই কথা অর্দ্ধোচ্চারিত করিল। আর একদিন প্রাতে গিয়া দেখি, মা হলে দাঁড়াইয়া আছেন, কুমারের (পোষ্যপুত্র) জ্যেষ্ঠভ্রাতা রোহিণী গোস্বামীর চারিবছরের কালোকোলো নধরদেহ ছেলেটি ক্ষুদ্র দুখানি হাত দিয়া তাঁহাকে বেড়িয়া ধরিল। বলিল, "আমায় বাড়ী পাঠাইয়া দাও।" মাতা হাসিয়া তার সঙ্গে আমোদ করিতে লাগিলেন। তার পর সে বলিল, "তুমি তোমার বাড়ী চল।" মা বুঝিলেন, পূর্ব্বদিন বধূরাণী প্রভৃতিকে লইয়া ছোটবাড়ীর বাগানে যখন শাকসবজী তুলিতে যান, বালক তখন সঙ্গে গিয়াছিল, আজ আবার সেখানে যাইতে বলিতেছে। তিনি হাসিলেন,

বলিলেন, "আগে তোমার খুড়িমাকে (বৌরাণীকে) নিয়ে এসো, তবে ত যাব !" বালক তখন বধূরাণীর প্রকোষ্ঠের দিকে দৌড়িয়া গেল। স্বচক্ষে দেখিয়াছি ৭৷৮ বছরের ব্রাহ্মণেতর বর্ণের ছেলে স্থানান্তরে যাইবার জন্য প্রণাম করিতে গিয়াছে, মা তাহাকে কোলে উঠাইয়া লইয়াছেন, তাহার হাতের কণ্ডুরোগ গ্রাহ্য করেন নাই। নাটোরের বর্ত্তমান লোকপূজ্যা মহারাণী যখন নিতান্ত বালিকা, আত্মীয়তাসূত্রে পিতামাতার সঙ্গে কখন-কখন তাঁহাকে দেখিতে যাইতেন। মাতার পায়ের কাছে বসিয়া-বসিয়া বালিকা শৈশবসুলভ কৌতূহল ও ঔৎসুক্যের সহিত সমস্তদিন প্রায় তাঁহার মর্ম্মময় জীবন প্রত্যক্ষ করিতেন। একদিন আদরের সহিত বলিলেন, "কত্তা, (রাজশাহীতে কর্ত্রীদের কত্তা বলে) কত্তা, আমি আপনার মত মহারাণী হব !" মা হাসিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, "তা তুই হবি কুকী !" তদবধি অনেককে সেদিনের কথা আমোদ করিয়া বলিতেন। এই ক্ষুদ্র লেখকের কথা উঠিলে

আমার অসাক্ষাতে বলিতেন, "পাগ্‌লাটা হাকিম হবে!"

আশ্রিত বিদ্যার্থীদের প্রতি তাঁহার করুণকোমল ব্যবহার আলোচনা করিলে এই মাতৃভাব আরো স্পষ্টীকৃত হইয়া উঠে। রাজশাহী-কলেজের উন্নতি-কল্পে তিনি কয়বারে অনেকটাকা দান করিয়াছিলেন। তা ছাড়া, পুটিয়ার বঙ্গবিদ্যালয় এবং লালপুর মধ্য-বিত্ত ইংরেজীস্কুল তাঁহারই অর্থসাহায্যে বরাবর পরিচালিত হইয়া আসিয়াছে। সংস্কৃতশিক্ষার উৎসাহ জন্য পুটিয়ার ও অন্যান্য স্থানের টোলেও তিনি বিস্তর সাহায্য করিতেন। এ সকলের উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থী দরিদ্র বালক ও যুবকদের পুস্তকক্রয়ের ও "ফি"এর সহায়তায় প্রতি বৎসর নিঃশব্দে যে সব দান হইত, তাহাও সামান্য নহে। এই সকল তাঁহার বিদ্যোৎসাহিতার প্রচুর প্রমাণ বটে, কিন্তু তাঁহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল তাঁহার সম্যক্ ব্যয়ে প্রতিপালিত এবং শিক্ষিত বিদ্যার্থীদের জন্য তিনি যাহা করিতেন, তাহার পরিচয়গ্রহণ না

করিলে তদীয় আন্তরিকতা এবং বৎসলভাবের যথার্থ গভীরতা বুঝা যায় না।

এই সকল ছাত্রের অনেকে তাঁহাকে কখন দর্শন করিতে পাইত না, কিন্তু তাঁহার অযাচিত মাতৃস্নেহ অলক্ষ্যে তাহাদের অভিষিক্ত করিত। ইহাদের ভিতর কোন কোন ছাত্রকে পুটিয়াস্কুল হইতে আরম্ভ করিয়া রাজশাহী কলেজে এবং কলিকাতার কলেজাদিতে অধ্যয়ন করান হইয়াছিল। ছুটির সময় আমরা যেমন পুটিয়ায় যাইতাম, এই ছাত্র-দিগকেও মাতৃ-আজ্ঞায় সেইরূপ সেখানে যাইতে হইত, কেহ না গেলে মহারাণী দুঃখিত হইতেন। এই ছাত্রদের শীর্ষস্থানে আমার বাল্যবন্ধু ভূতপূর্ব্ব "শিক্ষা-পরিচয়ের" সম্পাদক সুলেখক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী বি-এ-র নাম করা যাইতে পারে। অবকাশান্তে আমরা যখন ফিরিয়া যাইতাম, মাতা এই ছাত্রদের প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইতেন, ব্যবহার্য্য কোন্ কোন্ দ্রব্যের কাহার কি অভাব আছে। এবং

প্রতিবারে নূতন করিয়া গামছাখানি পর্য্যন্ত সঙ্গে দিতেন।

একটি ছাত্র দুর্ভাগ্যক্রমে কয়বার প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিয়া লজ্জায় ও মনস্তাপে পড়াশুনা ছাড়িয়া দিল। মাতা তাহার খোঁজখবর করিয়াও কোন সংবাদ পান না। আমি তখন জলবায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য লুপ্‌লাইন সাহেবগঞ্জে ছিলাম। ফিরিবার সময় পিতাঠাকুরমহাশয়ের আদেশে ৺রায় রাজীবলোচন রায় দেওয়ান-বাহাদুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া মুরশীদাবাদের পথে পুটিয়ায় আসিতেছিলাম। ছাত্রটি আমার বন্ধু, তখন রামপুর বোয়ালিয়ায় ছিলেন। সাক্ষাৎ হইলে তাঁহার মনের অবস্থা বুঝিলাম এবং মহারাণীমাতাকে কিছু না জানাইয়া বিদ্যালয় ত্যাগ করার জন্য তাঁহাকে অনুযোগও করিলাম। আমার মুখে সকল শুনিয়া মাতা বড় দুঃখিত হইলেন। বলিলেন, "খরচপত্রের জন্য সে কুণ্ঠিত হয় কেন?" আমি নিবেদন করিলাম যে, তাহাকে আর স্থানীয় কোন

স্কুলে পড়ান অনর্থক। মা যদি সম্মত হন, শিয়ালদহ মেডিক্যাল্‌স্কুলে তাহাকে ভর্ত্তি হইতে বলি। এই প্রস্তাব মহারাণীমাতা আহ্লাদের সহিত অনুমোদন করিয়া তাহাকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন। সে বন্ধুটি এক্ষণে ডাক্তার হইয়া দেশে চিকিৎসাব্যবসায় করিতেছেন।

৬

বিস্ময়ের কথা এই যে, তাঁহাতে মাতৃভাবের তাদৃশ প্রাচুর্য্য থাকিলেও ন্যায়পরতায় মাতা সমান শক্তি-শালিনী ছিলেন। দুই প্রহরের সময় তাঁহার কাছারী ভাঙিলে সেইদিন মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত সমাগত পত্রাদি এবং দৈনিক খরচপত্রের সুমারের খাতা অন্দরে পাঠান হইত। ভোজনান্তে মহারাণী সমস্ত কাগজপত্র পাঠ করিয়া দেখিতেন এবং প্রয়োজন হইলে মতামত দিতেন। কিন্তু কর্ম্মচারীদের কৃত খরচ কখন তিনি বাজেয়াপ্ত করিতেন না। কেবল একদিন আট-আনা খরচ লাল কালি দিয়া কাটিয়া দিয়াছিলেন। দেখা গেল, একটি প্রজা তাঁহার

সহোদরা ভগ্নীর ষ্টেট্‌সংক্রান্ত কোন কাজ করায় ঐ আট-আনা খোরাকী পাইয়াছে। দেওয়ানজী কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মহারাণীমাতা বলিয়া পাঠাইলেন যে, তাঁর ভগিনীর কার্য্যের জন্য পুত্রের ষ্টেট্‌ হইতে কেন খরচ পড়িবে? কুমার যখন পুটিয়ার ইংরেজীস্কুলে পড়েন, তখন একদিন জল-খাবারের ছুটী হইলে ছেলেদের সঙ্গে ক্রিকেট্‌ খেলিতেছিলেন। রাজবাটীর বক্সী রাধিকানাথ সেনের ভাগিনেয় বল্‌ নিক্ষেপ করিতে গিয়া হঠাৎ কুমারের চক্ষুতে আহত করিল। তিনি যন্ত্রণায় অধীর হইয়া তাহাকে গালি দেওয়ায় সে শাসাইয়া রাখিল, ছুটীর পর বুঝা যাবে! তার পর ছুটী হইয়া গেলে কুমারের পাল্‌কি "শিবের চৌকী" ও "মরাচৌকী"র মধ্যবর্ত্তী পথে অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া সুবুদ্ধি বালক অকস্মাৎ দৌড়িয়া-আসিয়া এক পার্শ্বের বরকন্দাজকে "মরাচৌকী"র দিকে ফেলিয়া দিল এবং ক্ষিপ্রহস্তে ধূলি লইয়া অন্য পার্শ্বের বরকন্দাজটার চক্ষে নিক্ষেপ করিল। তার

পর রক্ষকহীন পাল্‌কির মুক্তপথে কুমারকে সজোরে কয়বার মুষ্টাঘাত করিয়া নক্ষত্রবেগে দৌড়িয়া পলাইল। খবরটা কিঞ্চিৎ শাখাপল্লবিত হইয়া অনতিবিলম্বে রাজবাটীতে পৌঁছিলে মহারাণীমাতা কুমারকে ডাকিয়া প্রকৃত ঘটনা অবগত হইলেন। তিনি কুমারকেই দোষ দিলেন। খেলা করিতে করিতে ছেলেপুলের অমন হঠাৎ লাগিয়াই থাকে, সেজন্য গালি দেওয়া বড় অন্যায় হইয়াছে। বলিলেন, "কোকন, কাল তুমি স্কুলে গিয়া বক্সীর ভাগিনেয়ের সঙ্গে সদ্ভাবে খেলিয়া মাপ চাহিয়া আসিবে। নহিলে আমি জলগ্রহণ করিব না।" ওদিকে সেই বালক আত্মীয় বন্ধুদের কাছে যথেষ্ট ভৎর্সিত হইলেও ব্যাপারটা যে তেমন কিছু গুরুতর হইয়াছে, মনে করিল না। অতএব সে পরদিন নিয়মমত স্কুলে পড়িতে গেল। দেখিল, রাজকুমার আহত চক্ষু বাঁধিয়া আসিয়াছেন। জলখাবারের ছুটী হইলে কুমার আসিয়া বন্ধুভাবে তাহার হাত ধরিলেন এবং কহিলেন, "চল, খেলিতে

যাই!" ছেলেটি তাহাতে সম্মত হয় না। শেষে যখন শুনিলেন, মহারাণীর আদেশে কুমারকে সেভাবে আসিতে হইয়াছে, তখন খেলিতে গেল। কুমার সেদিন ব্যাট্ ধরিয়াই চলিয়া গেলেন, চক্ষুর চিকিৎসা জন্য অতঃপর ৪।৫ দিন স্কুলে আসিতে পারেন নাই। এই ক্ষুদ্র গল্পের নায়ক সেই "বীর" বালক মনোমোহন কর প্রৌঢ় বয়সে পদার্পণ করিয়াছেন। তাঁহার কয়বৎসর পূর্ব্বের দত্ত নোট্ হইতে শেষ কয় পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি:—"আমি মহারাণীমাতার নিকট পূর্ব্বোল্লিখিত ঘটনার পূর্ব্বে কোনদিন পরিচিত ছিলাম না। আমার দুষ্টামিই আমাকে তাঁহার নিকট পরিচিত করিয়া দেয়। কয়েকমাস পরে আমার অতি উৎকট জ্বর হয়। ক্রমাগত জোলাপের ঔষধ ব্যবহার করায় তিনদিন অবিশ্রান্তভাবে এমন বমন ও বিরেচন হইতে লাগিল যে, আমার জীবনের আশা লোপ পাইতেছিল। ডাক্তারগণ নিরাশ হইলেন। মহারাণীমাতার দাসীরা বারংবার আমার অবস্থা দেখিয়

গিয়া তাঁহাকে জানাইতে লাগিল। তখন তিনি স্বয়ং অম্লপিত্তের পীড়ায় অতিশয় কাতর হইয়াছিলেন। সেই সংবাদ পাইয়া তাঁহার কবিরাজ রাধিকাধর সেন মহাশয় আমার সঙ্কটাপন্ন অবস্থার দিন রাজবাটীতে আসিয়া মহারাণীর শারীরিক অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করেন। তিনি নিজের কোন কথা না বলিয়া অগ্রে আমাকে দেখিয়া যদি বাঁচানর কোন উপায় থাকে, তাহা করিতে বলেন। তৎক্ষণাৎ কবিরাজ মহাশয় আমায় দেখিতে আসেন এবং সামান্য কয়টি বটিকাদ্বারা বমন ও বিরেচন বন্ধ করিয়া আমাকে মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধার করেন। অন্ন ও বিশুদাসী মহারাণীমাতার আদেশ অনুসারে সমস্ত পুটিয়া ঘুরিয়া কার্ ঘরে অন্ন নাই, কার্ বস্ত্র নাই, কার্ ব্যাধির উপযুক্ত চিকিৎসা হইতেছে না, সন্ধান করিয়া তাঁহাকে বলিত। তিনি তদনুসারে ব্যবস্থা করিতেন।"

কুমারের বয়ঃপ্রাপ্তির কিছুদিন পূর্ব্বে রাজশাহীর কোন পুরাতন মোক্তার রাজবাটীর কার্য্যে শৈথিল্য

প্রভৃতি দোষে প্রধান কর্ম্মচারিগণের বিরাগভাজন হন। মোক্তারটি উপায়ান্তর না দেখিয়া প্রার্থনা করিলেন, মহারাণীর সমীপে হাজিরি দিয়া সকল কথা বলিবার সুযোগ তাহাকে দেওয়া হউক। অনেক দিনের আশ্রিত ব্রাহ্মণের এই ন্যায়সঙ্গত কথায় মাতা সম্মতি প্রকাশ করিলে কুমার ইচ্ছা-প্রকাশ করিলেন যে, তিনি অন্তরালে থাকিয়া মোক্তারের সকল কথা শুনিবেন। মা বলিলেন যে, "তাহা হইতে পারে না। আমি এমন অবিশ্বাসের কাজ করিতে পারিব না। সে লোক মনে করিবে, সব কথা কেবল আমিই জানিলাম। তুমি কেন প্রকাশ্যে সব শোন না?' শেষে তাহাই হইয়াছিল। কুমারের বিবাহের পূর্ব্বে মহিষরেখার এক ব্রাহ্মণ নিজ অবিবাহিতা কন্যাকে পুটিয়ায় লইয়া আইসে এবং রাজসংসারের কোন প্রতিষ্ঠাপন্ন অথচ স্বসম্পর্কীয় কর্ম্মচারীর গৃহে তাহাকে রাখিয়া দেয়। বলা বাহুল্য, তাহার সহিত কুমারের বিবাহ হয় নাই। মেয়েটি ক্রমে

বড় হইয়া উঠিল, পাত্র জুটে না, পিতা বলিয়া বেড়াইতে লাগিল যে, যখন বাক্যদান করিয়াছি, তখন কুমারের সহিত কন্যার বিবাহ হইয়াছে ধরিতে হইবে। ব্রাহ্মণ শুধু ইহাতে ক্ষান্ত না হইয়া মাঝে মাঝে নিজে ও মেয়েটির দ্বারা কুমার মহাশয়কে চিঠি লিখিতে লাগিল। তিনি মহা উত্যক্ত হইয়া একদিন আমাদের সমক্ষে মার কাছে প্রস্তাব করিলেন যে, সে কন্যার বিবাহ দেওয়াইয়া দেওয়া হউক। মহারাণী বলিলেন, "সে ব্রাহ্মণ নিজ জেদে কষ্ট পায়, আমি কি করিব ? পাত্র কোথায় পাইব ?" কুমার সাড়েতিন-আনির কুমারের নাম করিলেন, বলিলেন, "তার বিবাহ হইয়াছে বটে, কিন্তু আমি ফুস্‌লাইয়া তাহাকে রাজি করিতে পারি।" মা বলিলেন, "তা হইতে পারে না।" কুমার—"আপনি মতামত কিছু দিবেন না।" মহারাণী—"তাই বা কেমন করিয়া হইতে পারে ? এ বিবাহে যদি মত দিতে পারি তবে তোমারও বিবাহ দিতে পারি। আর কাহারও উপর

আমার অধিকার নাই, একা তোমায় বলিতে পারি।” মা হাসিলেন। এ হাসির অর্থ একটু রহস্য, কুমারের মন জানিবার কৌতূহল। কুমার বলিলেন, “তাই দেন!” মার মুখে সেই হাসি! আমায় সুধাইলেন, “শ্রীশ, কি বল?” আমি বলিলাম, “তা হ'লে বাড়ীতে কাক বসিতে পাবে না, অমন কথাও বলিতে নাই!” সকলে হাসিয়া উঠিলেন।

একদিন প্রাতে আমরা মহারাণীমাতার কাছে বসিয়া আছি, এমন সময় খবর আসিল, পুটিয়ার এক কুপল্লীতে এক গুলিখোর ব্রাহ্মণ মারা গিয়াছে, তাহার সৎকার হয় না। কোন্ সদ্ব্রাহ্মণ তাহার দাহকার্য্যে সহায়তা করিবে? ফণী মহাশয় উপস্থিত ছিলেন, তিনি বলিলেন, “সে আর ব্রাহ্মণ কিসে?” চারি-আনির রাণীঠাকুরাণী বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, তাঁহার আমলারা সকলে অনুপস্থিত, এ অবস্থায় পাঁচ-আনির বাটী হইতে ব্রাহ্মণ আমলা দেওয়া হউক। ইহাতে কেহ কেহ বলিলেন, “এ বড়

অত্যাচার। তুমি মনিব, পেটের দায়ে হয় ত ব্রাহ্মণ আমলারা তোমার কথা শুনিবে, কিন্তু তোমার একবার ভাবা উচিত যে, কাজটি কি গর্হিত!" মা বলিলেন, "যদি সকল তরফের লোক যায়, আমাদেরও যাইবে। তাহা নহিলে কেমন করিয়া বলিব?" রাজসংসারের পেন্‌শন্‌প্রাপ্ত কাশী-প্রবাসী এক আত্মীয় কর্ম্মচারীর অল্পবয়স্ক পুত্র এই সময়ে আসিল এবং বলিল যে, শব লইয়া যাইতে সে প্রস্তুত। আমি বলিলাম, "দেখিও, কথা কাশী পর্য্যন্ত পৌঁছিবে!" এই নবযুবকের উৎসাহাতিশয্য দেখিয়া মা হাসিলেন, বলিলেন—"আচ্ছা, অনুমতি দিতেছি, তোমরা দু ভায়ে যাও,—কেমন?"

আর একদিন ফণী মহাশয়ের সঙ্গে মহারাণীর একটি জোতের কথা হইতেছিল। জোৎটি মাতার জায়গীর সম্পত্তির মধ্যে। মা বলিলেন, দুইজন ভদ্রলোক তাহা লইয়া বিবাদ বাধাইতেছে, তিনি আর কোন ভদ্রলোককে জোৎ দিতে ইচ্ছা করেন না—চাষাদের দিবেন।

প্রসঙ্গক্রমে একদিন ভগিনীর পুত্রকন্যাদের বিবাহের কথা উঠিলে মা বলিলেন, "বড়মানুষের ঘরে বিবাহ দিতে আমি দিব না। তাতে কত সুখ, সবই ত দেখিলাম। ৩।৪ হাজার টাকা আয়ের গৃহস্থের বাড়ীতে বিবাহ দেওয়া ভাল।" ত্রৈলোক্য বলিল, "হাঁ, তা হ'লে ত কাজকাম করিতে হবে!" বলিলাম, "গৃহস্থের ঘরে কাজ করিয়াও যে সুখ, তোমার রাজার ঘরে তাহার কিছুই নাই।" মা পুনরায় কহিলেন, "কোকনেরও বিয়ে বড়মানুষের ঘরে হতে দিব না। বড়মানুষের জামাই হ'লে অস্বাধীন হতে হয়।"

স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার ও গভীরতার সঙ্গে সঙ্গে গত বিশবৎসর-মধ্যে এদেশের উচ্চশিক্ষিতা মহিলারা রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিয়া আসিতেছেন। কিন্তু ২৫।২৬ বৎসর পূর্ব্বে লর্ড রিপনের আমলে স্বায়ত্ত-শাসনপ্রণালীর(Local Self-Government) অনুষ্ঠানপত্র প্রথমে যখন গবর্ণমেণ্টগেজেটে মুদ্রিত

হয়, তখন মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবীর ঐকান্তিক পোষকতায় সর্ব্বাগ্রে পুটিয়ার ন্যায় অপেক্ষাকৃত নগণ্যস্থানে সে-সম্বন্ধে সভা ও আনন্দোৎসব হইয়াছিল, ইহা সম্ভবত অনেকেরই জানা নাই। ঐ সভায় পর্দ্দার অন্তরালে মহারাণী স্বয়ং অন্যান্য সম্ভ্রান্ত কুলমহিলাদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন এবং দেওয়ানজী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই সভাধিষ্ঠানের কয়দিন পরে এদেশের ভিতর কৃষ্ণনগরে দ্বিতীয় অধিবেশনের খবর পাওয়া গেল। পুটিয়ার সভার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ তখনকার সাপ্তাহিক "বেঙ্গলি"তে প্রকাশিত হইবামাত্র দেশীয় ও ইংরেজী সংবাদপত্রসমূহে মহারাণীমাতার সাধুবাদ ঘোষিত হইতে লাগিল এবং নানারূপে বৎসরাধিক-কাল তাহা ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। মাতা ইহাতে বড় লজ্জিত হইলেন। গোপনে সৎকার্য্য করাই তাঁহার অভিপ্রেত এবং প্রকৃতিগত, খবরের কাগজের ঢক্কানিনাদ তিনি আদৌ পছন্দ করিতেন না। ফলত এই উপলক্ষে একদিকে দেশের

কল্যাণকল্পে তিনি যেমন কর্ত্তব্যজ্ঞান ও দৃঢ়চিত্ততার পরিচয় দিয়াছিলেন, অপর পক্ষে তাঁহার স্বাভাবিকী লজ্জাশীলতাও তেম্‌নি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তিনি জীবনে আর কখন তেমন প্রত্যক্ষভাবে কোন সভাসমিতিতে যোগদান করেন নাই, এবং যাত্রাদি উপলক্ষে সরিকদের গৃহে কদাচিৎ নিমন্ত্রণরক্ষার্থ যাইতেন। কিন্তু এই সংস্রবে অন্য প্রধান সরিক চারি-আনির বাটীতে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যাইতে কুণ্ঠিত হন নাই। লোক সমাগম অধিক হইবে বলিয়া চারি-আনির নূতন প্রশস্ত দ্বিতল গৃহে সভার স্থান নির্ব্বাচিত হইয়াছিল, ইহাতে কোনরূপ আপত্তি না করিয়া তিনি বরং উৎসাহ দিয়াছিলেন এবং আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার ন্যায় অসূর্য্যম্পশ্যরূপা আদর্শ-হিন্দুবিধবার পক্ষে সাধারণ রাজনৈতিক সমিতিতে সে ভাবে যোগ দেওয়া সম্ভব, ইহা বস্তুত তাঁহার পূর্ব্বে ইদানীন্তন-কালে আর দেখা যায় নাই। ইহার পর যত দিন যাইতে লাগিল, ততই সংবাদপত্রে ও দেশের

চারিদিকে অন্যান্য সভাসমিতিতে তাঁর "রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়ার" কাহিনী প্রশংসার নানা-স্বরে অবিরত বর্ণিত হইতেছিল—তিনি কিছু ব্যতি-ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। টাউন্‌হলের বিরাট্ সভায় আনন্দমোহন বসু মহাশয় প্রথমেই মহারাণীমাতার ও পুটিয়ার সমিতির উল্লেখ করিয়াছেন, তার পর মহারাণী স্বর্ণময়ীর কথা বলিয়া আত্মশাসনসম্বন্ধে বঙ্গের এই দুই লোকপূজ্যা সম্ভ্রান্তমহিলার (the two distinguished ladies of Bengal) আগ্রহ ও সহানুভূতির পরিচয় দিয়াছেন শুনিয়া তিনি ভারি কুণ্ঠিত হইলেন, যেন কি-একটা অন্যায় কাজ করা হইয়াছিল! সে যাহা হউক, স্বায়ত্তশাসনসম্বন্ধে কোথায় কি হইতেছে, তাহার খুঁটিনাটি সংবাদ তিনি সর্ব্বদা রাখিতেন। রাজশাহীতে মিউনি-সিপালিটির প্রথম চেয়ারম্যান্ কে হন জানিতে তিনি উৎসুক ছিলেন এবং আগ্রহে একদিন আমায় সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। একদিন প্রাতে আমরা কয়জনে তাঁহাকে প্রণাম করিতে গেলাম।

মা রাজবাটীর কেরাণী ব্রজসুন্দরকে একখানি অপেক্ষাকৃত পুরাতন "সাধারণী" দিয়া বলিলেন, সেখানি তাঁর কাছে ছিল। পরে আমায় বলিলেন, "তুমি কি দেশে গিয়া আত্ম-শাসনের সভা করিয়াছিলে ? (তিনি আত্ম-শাসনই বলিতেন।) এই কাগজে লেখা আছে, তুমি চাষাদিগকে আত্ম-শাসন বুঝাইয়াছিলে, তোমার বড় ভাই সভাপতি হইয়াছিলেন।"

স্বায়ত্ত-শাসনসংক্রান্ত ঢাকায় যে সভা হইয়াছিল, তাহাতে বিশহাজার-লোকসমাগম হয়। ইংলিশ্‌-ম্যানের তারের খবরের স্তম্ভে এই সংবাদ পড়িয়া আমি মহারাণীমাতাকে জানাইলাম। ইহাতে তিনি আনন্দলাভ করিয়াছিলেন। আর একদিন কলিকাতা মিউনিসিপালিটির নূতন নির্ব্বাচনের কথা হইতেছিল। সে উপলক্ষে রাজধানীতে বড় ধুমধাম হইয়াছিল। করদাতৃগণ সে সময় যেরূপ আগ্রহ ও উৎসাহ দেখাইয়াছিলেন, তাহা আত্ম-শাসনে অভ্যস্ত দেশেই সম্ভব। হাইকোর্ট হইতে

বিচার হইয়া গিয়াছিল, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মিউনিসিপাল কমিশনর হইতে পারেন না। তাহা লইয়া সে দিন হুলুস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল। মাতা এই মোকদ্দমার কথায় জিজ্ঞাসা করিতে ছিলেন, এই "ডাক্তার" উপাধির অর্থ কি? আমি বুঝাইয়া দিলাম। মিত্রমহাশয় "ওয়ার্ড-ইন্‌ষ্টিটিউট্"-সম্পর্কে সেকালের কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের কর্ত্তৃত্বাধীন তরুণ জমিদারদের বিলক্ষণ পরিচিত ছিলেন, স্বর্গীয় রাজাকেও কিছুকাল তাঁহার পর্য্যবেক্ষণে থাকিতে হইয়াছিল। অতএব মহারাণী মাতা সেদিন তাঁহার কথা অনেক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

সাধারণত দেশের বর্ত্তমান ঘটনাবলীর খবরা-খবর সকলই তিনি জানিতেন এবং আগ্রহের সহিত সকল বিষয়ের তথ্যানুসন্ধান করিতেন। গভর্ণর জেনারেলের জেল্ সম্বন্ধে মন্তব্যপত্রে অনেক নূতন কথা ছিল। এই সময়ে স্থরেন্দ্রবাবুর প্রেসিডেন্সি-ম্যাজিষ্ট্রেট্ হওয়ার খবরও সংবাদপত্রে বাহির হইল।

মহারাণীমাতার সহিত এই উভয় বিষয়ে আমাদের কথাবার্ত্তা হইয়াছিল।

তিনি রাণী-উপাধি লাভ করিলে খেলাৎদান-সম্বন্ধে গবমেণ্টের সহিত পত্রব্যবহার হইল। তিনি কুলবধূ, দরবারে উপস্থিত হইতে অক্ষম—তাঁহার উত্তরের মর্ম্মার্থ এইরূপ। নজর বলিয়া অর্থোপহার দেওয়ারও দরকার তিনি মনে করেন নাই। যথাসময়ে দরবারের দিন স্থির হইলে দেওয়ানজীকে তাঁহার পক্ষে উপাধির সনন্দ আনিতে জেলার সদরে যাইতে হইল। তাঁহাকে মাতা বলিয়াছিলেন, "গতবৎসর প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্ আসিলে বাঁকিপুরের দরবারে আমার নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। তখন আমি কলেক্টর ডয়েলীসাহেবকে লিখিয়াছিলাম, নিমন্ত্রণের গৌরবরক্ষার্থ আগামী শীতঋতুতে আপনার যোগে আমি গরীবদুঃখীদের কিছু শীতবস্ত্র দিব। সেই প্রতিশ্রুতিপালনের সময় উপস্থিত। আপনি কলেক্টরের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া দরবারের পূর্ব্বেই হাজারটাকার কম্বল শীতার্ত্তদের বিতরণ করিবেন।

কিন্তু আমার এই উপাধিপ্রাপ্তি উপলক্ষে কোনরূপ দান হইতে পারিবে না। দরবারের পর কিছু বিতরণ করিলে লোকে বুঝিবে যে, উপাধি পাইয়া আমার আহ্লাদ হইয়াছে।” ইহার অনেকদিন পর ডয়েলীসাহেব, যখন ভাগলপুরের কলেক্টর, সেখানকার কলের জলের জন্য কিছু চাঁদা দিতে মহারাণীকে অনুরোধ করেন। তদুপলক্ষে মাতা আমায় বলিয়াছিলেন, “কলিকাতায় তোমার কাছে টাকা পাঠাইব। তুমি সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাহা তাঁকে দিও, কিন্তু বিশেষ করিয়া বলিও যে, দানের কথাটা যেন গোপন থাকে, খবরের কাগজে না উঠে।” ইহার পরই তিনি বড় পীড়িত হইয়া পড়েন। চাঁদা পাঠান হইয়াছিল কি না, বলিতে পারি না।

৮

এই জীবনীপ্রসঙ্গমধ্যে এমন অনেক কথা বলিতে হইতেছে, যাহা ইহার ক্ষুদ্র লেখকের জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে অথবা নিতান্ত শৈশবে সংঘটিত। যাঁহাদের

কৃপায় সে সকল বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, আমার পিতৃদেব [মহারাণীর দেওয়ান ?] তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। তিনি দীর্ঘকাল রাজসংসারের পেন্‌শন্ ভোগ করিয়া একাশীবৎসর বয়সে সম্প্রতি (গত ৮ই কার্ত্তিক) স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। মহারাণীমাতার স্বামী রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ যখন নাবালক এবং কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের তত্ত্বাবধানাধীন, তখন হইতে বরাবর তিনি প্রথমে ম্যানেজার ও পরে দেওয়ান-রূপে পুটিয়ার বিখ্যাত ষ্টেটের সহিত ঘনিষ্ঠসম্বন্ধ ছিলেন। কেবল রাজার পরলোকগমনের পর কয়বৎসর অন্যত্র কর্ম্মগ্রহণ করিতে বাধ্য হন। ইহার কারণ, বিষয় পুনরায় কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের অধীন হইলে নাবালিকা রাণীর পিতা বাবু ভৈরবনাথ সান্যাল অবৈতনিক ম্যানেজার নিযুক্ত হইলেন। পিতা ও কন্যার ইচ্ছা এবং আগ্রহ ছিল যে, পিতৃ-দেব প্রধানপদে থাকিয়া যান, কিন্তু ভৈরবনাথবাবু তাঁহার সমবয়স্ক ও বন্ধু বলিয়া কার্য্যক্ষেত্রে কোন-রূপ অধীনতা তিনি বাঞ্ছনীয় মনে করেন নাই।

সে যাহা হউক, রাজার বয়স যখন ১১।১২ বৎসর, তখন ছয়বৎসরমাত্রবয়স্কা শরৎসুন্দরীর সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। ইহার অল্পদিন পরে রাজার মাতা রাণী দুর্গাসুন্দরী ইহলোক ত্যাগ করেন এবং প্রায় দুইবৎসর পরে গর্ণবমেণ্ট পিতৃদেব-মহাশয়কে ষ্টেটের অছি ম্যানেজার নিযুক্ত করিয়া ছিলেন। এইরূপে তিনি অপত্যবৎ স্নেহ এবং যত্নে এই প্রভু শিশুদম্পতির রক্ষণাবেক্ষণ করিবার অবসর লাভ করিয়াছিলেন। যদিও দুইটা ষ্টেটের—চারি-আনির ও পাঁচ-আনির—কর্ত্তৃত্বভার পিতৃ-দেবের হস্তে ছিল, রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ সাবালক হইয়া অনুরোধ করিলে তিনি আহ্লাদের সহিত তাঁহার দেওয়ানী গ্রহণ করিলেন। ইহাতেই বুঝা যাইবে, মহারাণীমাতা চিরদিন কেন তাঁহাকে পিতৃবৎ সম্মান করিতেন।

মহারাণী তাঁহার অতুলনীয় পবিত্রজীবনে যে সকল লোকহিতকর কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, দীর্ঘ-কাল কর্ম্মসূত্রে আমার পিতৃদেবকে অবশ্যই তাহার

সহায়তা করিতে হইয়াছিল। সুতরাং আজ তদীয় পরলোকগমন উপলক্ষে বিশেষভাবে যে দুইএকটি কথার উল্লেখ করিতেছি, তাহা ভরসা করি পুত্রের পিতৃস্মৃতির অর্চ্চনামাত্র বলিয়া কেহ অপ্রাসঙ্গিক মনে করিবেন না।

কবি বিদ্যাপতি বলিয়াছেন—

সুন্দর কুলশীল, ধনী, বরযুবক
কি করব লোচনহীনে।
কি করব জপতপ, দানব্রত নৈষ্ঠিক
যদি করুণা নহি দীনে॥

মহারাণীমাতা জীবনে অনুদিন যেমন জপতপ, দানব্রত, নিষ্ঠাচারে রত ছিলেন, দীনজনের প্রতি তাঁহার করুণা সেইরূপ সর্ব্বব্যাপিনী, অতলস্পর্শিনী ছিল, ইহা নূতন করিয়া বলিতে হইবে না। এই দীনজনের প্রতি করুণা দেওয়ানজির চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল। রামপুর বোয়ালিয়ার (রাজশাহীতে) ম্যানেজারির আমলে তিনি দীর্ঘকাল অকাতরে স্কুলের বালক হইতে অল্পবেতনের আমলা

ও দুঃস্থ সকল শ্রেণীর ন্যূনাধিক দুইশত লোককে নিত্য যে অন্নদান করিতেন, ইহা আমার জন্মের পূর্ব্বেকার কথা। ফলত তিনি ও তাঁহার প্রতি-বাসী এবং পরমসুহৃদ্ দীননাথ সিংহ মহাশয় প্রাত্যহিক অন্নদানব্যাপারে এরূপ মুক্তহস্ত ছিলেন যে, রাজশাহীতে তাঁহাদের কথা প্রবাদ হইয়া আছে। সিংহমহাশয় আমার পিতামহের বন্ধু ছিলেন এবং পিতৃদেব তাঁহাকে পিতৃব্যবৎ জ্ঞান করিতেন। বাল্যকালে এই দীর্ঘ সৌম্যমূর্ত্তি পরহিতরত মহাত্মাকে সর্ব্বদা দেখিতাম। তাঁহার যেমন দয়া, তেম্নি মধুর সৌজন্য ছিল। কাহারও উপর কখন বড় রাগ করিতেন না, একবার কেবল একজনের কদাচারে রুষ্ট হইয়া বিরক্তিপ্রকাশ করিয়াছিলেন। সে লোকটি কাছে বসিয়াছিল, বলিল, "মহাশয়, বলি, সবারই পক্ষে আপুনি দীননাথ, আর আমার পক্ষেই সিঙ্গী!" তাঁহার এক বন্ধুপুত্র সম্বন্ধে নাতি—জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আচ্ছা ঠাকুরদাদা, আপনি জমাখরচ রাখেন না কেন?"

আদরে প্রশ্নকর্ত্তার পিঠ চাপ্‌ড়াইয়া ঠাকুরদাদা উত্তর করিলেন, "ভাই, জমাখরচ রাখিলে যে টাকার উপর মায়া হয়!" এই মহাত্মার এবং পিতৃদেবের বোয়ালিয়ার কার্য্য যাহা দেখিয়াছি, তাহা আমার ভাল মনে পড়ে না, কিন্তু আমাদের পুটিয়ার বাসার নিত্য লোকসমারোহ ভুলিবার নহে। মহারাণীমাতার নিকট দানলিপ্সু অথবা কাজকর্ম্মপ্রার্থী যে সকল লোক আসিত, পিতৃদেব নিজের সাধ্যমত এবং পরম সমাদরে বরাবর তাহাদের আতিথ্যসৎকার করিতেন। আহারাদি বিষয়ে আমাদের সহিত এই সব অতিথির কোন পার্থক্য থাকিত না এবং অনেকসময় এরূপ ভিড় হইত যে, আমাদের পাঠগৃহ পর্য্যন্ত তাঁহারা দখল করিয়া বসিতেন।

এই সংখ্যায় মহারাণীর কথা যাহা লিখিত হইল, তাহার অধিকাংশ পিতৃদেবের কাছে শুনিয়াছি।

পুঠিয়াগ্রামে গোপীনাথ সান্যাল মহাশয় একজন বিশেষ ক্ষমতাশালী লোক ছিলেন। চারি-আনির

রাণী সূর্য্যমণি দেবী তাঁহার সহোদরা ভগিনী। তাঁহার দ্বারা অবশ্য সান্যাল মহাশয়ের অনেকরূপ সাহায্য হইত। কিন্তু তিনি যেরূপ বুদ্ধিমান্ ও কার্য্যক্ষম ছিলেন, রাণীর সহায়তা না পাইলেও তাঁহার উন্নতির কোন প্রতিবন্ধক ঘটিত না। জমিদারী এবং পত্তনীতে ক্রমশ তিনি পঁচিশহাজার টাকা লাভের সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, এবং দোলদুর্গোৎসবাদি ক্রিয়াকলাপে বিস্তর ব্যয় করিতেন। সর্ব্বাপেক্ষা অতিথিসেবায় তাঁহার বড় প্রীতি ছিল। তাঁহার দুই পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াই মারা যান, কনিষ্ঠপুত্র ভৈরবনাথ সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইয়া পিতার যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ ও অতিথিসেবা স্থির রাখিয়াছিলেন। মহারাণী শরৎসুন্দরী তাঁহারই জ্যেষ্ঠা কন্যা, কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীসুন্দরী তাঁহার জন্মের বারবৎসর পরে ভূমিষ্ঠা হন। পিতার দেবোত্তরসম্পত্তির তিনিই এক্ষণে সেবায়েৎ।

সন ১২৬৫ সালের ২৩শে আশ্বিন মহারাণী

জন্মগ্রহণ করেন। শিশুকালাবধি তিনি বড় শান্ত ও সুশীলা ছিলেন, ভারি বুদ্ধিমতী কিন্তু ধীরবুদ্ধি। অন্দরমহলে মেয়েদের কাছেই থাকিতে ভালবাসিতেন। পিতার যত্ন এবং চেষ্টায় কখন কখন বহির্ব্বাটীতে আসিলেও বেশীক্ষণ থাকিতে পারিতেন না। সেখানে পিতা প্রজাদের উপর ধমক-চমক করিলে কাঁদিতে কাঁদিতে ভিতরে পলাইতেন। একবার একজন প্রজা গুরুতর অপরাধ করায় সান্যালমহাশয়ের আদেশে প্রহৃত হইল। দেখিয়া পঞ্চমবর্ষীয়া শরৎসুন্দরী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, সেই অবধি তিনি আর বাহিরের বাটীতে আসিতেন না। একটু বেশী বয়সে হাঁটিতে শেখেন, হাঁটিতে শিখিবার জন্য চাকরেরা তাঁর প্রিয়খাদ্য কমলালেবুর লোভ দেখাইত।

গর্ভ ধরিয়া সাতবৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার পিতামহীর তিনি বড় স্নেহপাত্রী ছিলেন। পিতামহী মাধবপুরের ভাদুড়ীদের কন্যা, পিত্রালয় হইতে কিছু বিষয় পাইয়াছিলেন। তিনি

ভারি তেজস্বিনী ছিলেন এবং রাজবাটীতে পৌত্রীর বিবাহ দিতে কিছুতে ইচ্ছুক ছিলেন না। বরং, বিবাহ হইল এই দুঃখে কিছুদিন পরে তাঁহার মৃত্যু হয়। অনিচ্ছার কারণ, এক জেলে গণক গণনা করিয়া বলিয়াছিল যে, অত্যল্প বয়সে শরৎসুন্দরীর বৈধব্য ঘটিবে। মহারাণীমাতা গল্প করিতেন যে, তাঁহার প্রতি তাঁর স্নেহের সীমা ছিল না এবং শৈশবে তিনি পিতামহীকে "ছাওয়াল" বলিতেন। রাজবাটীর ঠাকুরাণীরা বিবাহের পর শিশুদম্পতিকে লইয়া সেকালের প্রথামত খুব কৌতুক করিতেন। বালিকা স্বামীকে বলিতেন, "লাল পাত্র।" ঠাকুরাণীরা তামাসা করিতেন, "এই তোমার বাপ!" ইত্যাদি। শরৎসুন্দরী প্রথমে বিশ্বাস করিতেন, পরে শরীর পরীক্ষা করিতে করিতে পিতার দেহের চিহ্নবিশেষ দেখিতে না পাইয়া মাটীতে পড়িয়া কাঁদিতেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে জ্ঞান হারাইতেন! বালক রাজা ঠাকুরাণীগণের উপর বিরক্ত হইয়া ওরূপ করিতে নিষেধ করিতেন। মহারাণীর

শৈশবে স্থিরবুদ্ধির উদাহরণস্বরূপ তাঁর প্রাচীনা পরিচারিকাদের বলিতে শুনিয়াছি, বিবাহের পর কাহারও নির্দ্দেশ ব্যতীত তিনি অনেকগুলি মহিলার ভিতর হইতে শাশুড়ীকে চিনিয়া প্রণাম করিয়াছিলেন। বিবাহ রাজবাটীতে হইয়াছিল। পরদিন প্রত্যুষে বালিকা স্নেহময়ী পিতামহীকে মনে করিয়া বলিয়াছিলেন, "রাত ত পোহাল, কিন্তু আমার "ছাওয়ালের" রাত ত থাকিয়া গেল।" পিত্রালয়ের দাসীদের বস্ত্রাদিতে রাজ বাটীতে নিক্ষিপ্ত চূনহলুদের লাল রং দেখিয়া রক্ত ভাবিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়াছিলেন—"উহাদের মারিয়া রক্ত পাড়াইয়াছে।"

১০।১১ বৎসর বয়সেই মহারাণীর হিন্দুধর্ম্মের অনুষ্ঠানে অনুরাগ ও দীনদরিদ্রের প্রতি দয়া আত্মীয়স্বজনমধ্যে বিলক্ষণ পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল। কুমার যোগেন্দ্রনারায়ণ এই সময়ে কলিকাতার ওয়ার্ডস্ ইনষ্টিটিউটে বিদ্যাশিক্ষার্থ প্রেরিত হইয়াছিলেন এবং রাজবাটীতে আত্মীয়

অভিভাবিকা স্ত্রীলোক কেহ ছিলেন না। অতএব বালিকা রাণীকে পিত্রালয়ে থাকিতে হইত। পুটিয়ার রাজা জগৎনারায়ণ ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী রাণী ভুবনময়ী দেবী কাশীধামে যে শিবমন্দির ও ছত্রের স্থাপনা করিয়াছিলেন, তাহার বন্দেজি খরচপত্র কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের পক্ষ হইতে প্রদত্ত হইত না। শরৎসুন্দরী তখন নিতান্ত বালিকা হইলেও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাঁহাকে কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস্ হইতে খোরপোষ্ বলিয়া যে টাকা দেওয়া হয়, তাহার দ্বারা কাশীতে দেবসেবাদির ব্যয়নির্ব্বাহ হইবে। ইহা ছাড়া, তিনি যে সব নজর পাইতেন, তাহাও কখন নিজে রাখিতেন না, কাশীর খরচ জন্য পাঠাইয়া দিতেন।

ছেলেবেলায় রাজা, রাণীর সঙ্গে খেলা করিতেন এবং তাঁহাকে বড় ভালবাসিতেন। কিন্তু সাবালক হওয়ার পর প্রথমযৌবনে এই স্নেহ স্থির ছিল না। সে সময়ে পাশ্চাত্যসভ্যতার নবীন অভ্যুদয়, দেশীয় সংস্কারমাত্রই বিলাতী বন্যায় ভাসিয়া যাইতেছিল।

তখন বাঙ্‌লার অন্যান্য স্থানের ন্যায় রাজশাহীর ভদ্রসমাজেও স্ত্রীশিক্ষার চলন ছিল না। স্ত্রীলোকে লেখাপড়া শিখিলে অল্পবয়সে বিধবা হয়, এই কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া মহারাণীর পিতা তাঁহাকে আদৌ বিদ্যাভ্যাস করিতে দেন নাই। যোগেন্দ্র-নারায়ণ ১২৩৫ সালের ফাল্গুনমাসে যখন সাবালক হইয়া বিষয়ভার গ্রহণ করিলেন, শরৎসুন্দরী তখন ত্রয়োদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। তিনি পিতৃদেবের নিকট দুঃখপ্রকাশ করিলেন যে, রাণীকে শিক্ষিতা করিবার কোন বন্দোবস্ত করা হয় নাই। সেই অবধি তাঁহার পড়াশুনার ব্যবস্থা হইল এবং ছয়মাসের ভিতর তিনি একরূপ লিখিতে পড়িতে শিখিলেন।

কিন্তু শুধু বিদ্যাশিক্ষাই যথেষ্ট নহে। স্ত্রীকে পূরামাত্রায় মেম সাজাইতে না পারিলে সেকালে শিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত যুবকদের মন উঠিত না। লক্ষ্মী, সীতা, সাবিত্রীর ছায়াশ্রিতা হিন্দুসহধর্ম্মিণীর প্রেমপূর্ণ হৃদয় উপেক্ষা করিয়া তাঁহারা পাশ্চাত্য

পৌরুষভাবপ্রধান স্ত্রীসমাজের পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং গৃহিণীগণ সেই আদর্শ সফলীকৃত করিতে না পারিলে সংসার আঁধার দেখিতেন। ওয়ার্ডস্ ইন্‌ষ্টিটিউটের বিলাতীভাবপুষ্ট নবীন যুবক রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণের ঠিক সেই দশা হইয়াছিল। তাঁহার ইচ্ছা, রাণী তাঁর সহিত অনেকের সমক্ষে কথা কন, লজ্জাশীলা তাহা পারিতেন না। হিন্দু-ধর্ম্মের নিষিদ্ধ আহারাদি করাইবার চেষ্টাও হইত; বলা বাহুল্য, তাহা বিফল হইয়াছিল। মাঝে মাঝে স্বামী প্রকাণ্ড দর্পণ সমক্ষে রাখিয়া কিশোরী বধূকে মেমদের হাবভাব শিখাইবার যত্ন পাইতেন, কিছুতেই লজ্জা ভাঙিত না। রাণীর অশ্রুধারা বহিত, কিছুতে বিনত চক্ষু উঠাইতেন না। রাজা বিষয়ের ভার-গ্রহণ করার কিছুদিন পরেই নীলকর সাহেবদিগরে সঙ্গে রাজশাহীস্থ অনেক জমিদার ও বহুসংখ্যক প্রজার বিবাদ উপস্থিত হইল। যোগেন্দ্রনারায়ণ ইহাতে একজন নেতা ছিলেন এবং স্থানীয় রাজকর্ম্ম-চারীদের দ্বারা বিচারপ্রাপ্তির সম্ভাবনা কম বুঝিয়া

দৌরাত্ম্যনিবারণের উপায়বিধান জন্য দেওয়ান সঙ্গে কলিকাতায় আসিলেন। কিছুদিন পরে রাণীকেও তথায় লইয়া আসা হইল। রাজধানীতে সাবালক হওয়ার পর রাজার সেই প্রথম আগমন। দেখিতে দেখিতে কয়েকটি "বড়লোকের" সংসর্গে পড়িলেন এবং সংক্ষেপে, হিন্দুসমাজের চক্ষে যাহা-কিছু দূষণীয় তাহাতে অভ্যস্ত হইলেন। ইহাতে বালিকা বড় ক্ষুণ্ণ হইতেন এবং প্রিয়দাসী অক্রূর দেওয়ানজিকে তাঁহার কষ্টের কথা প্রায়শ জানাইত। একদিন রাজার কেমন সখ হইল, নিজের ভুক্তাবশিষ্ট রাণীকে খাইতে বলিবেন এবং না খাইলে তাঁহাকে বিশেষরূপ শাসন করিবেন। তাহার পর পাচক-ব্রাহ্মণদ্বারা বহির্ব্বাটীতে ইচ্ছামত পাক করাইয়া অন্দরে আহার করিলেন ও পাত্রাবশিষ্ট স্ত্রীকে খাইতে বলিলেন। ত্রয়োদশবর্ষের বালিকা দৃঢ়তার সহিত উত্তর করিলেন, "আপনার ভোজনাবশিষ্ট আমি অবশ্য খাইব, কিন্তু আমার সাক্ষাতে এই অন্দরমধ্যে পাচিকা পাক করিয়া দিবে। তাহাই

আপনি আহার করিলে খাইতে পারি। নচেৎ বাহিরের প্রস্তুত কিছুই আমি ছুঁইব না।" এই বিষয় লইয়া রাজার সহিত তাঁহার ঘোরতর তর্কবিতর্ক হইতে লাগিল এবং দাসীরা ভয় পাইল, পাছে কোন অবৈধ আচরণ হয়। দেওয়ানজির বাসা রাজবাটীর অতি সন্নিকটে ছিল এবং সেই সময়ে তিনি রাজ-বাটীতে উপস্থিত ছিলেন। সংবাদ পাইয়া তিনি একেবারে অন্দরমহলে প্রবেশ করিলেন এবং দাসীদের দ্বারা মহারাণীকে সরিতে বলিয়া রাজাকে তাঁহার রূঢ় ব্যবহারের জন্য অনেক উপদেশ দিলেন। সেই অবধি রাজা সহধর্ম্মিণীর প্রতি আর সেরূপ আচরণ করিতেন না।

এইরূপ অন্যায় ব্যবহারের কথা কখন কেহ মহারাণীর মুখে শুনিতে পায় নাই। কেবল পিতৃ-দেবের পেন্‌শন্‌গ্রহণের দিন রোদন করিতে করিতে আমার সমক্ষে তিনি বলিয়াছিলেন, তাঁহার চির-দুঃখের কষ্টের জীবনে দেওয়ানজি চিরদিন হিতা-কাঙ্ক্ষা করিয়াছেন। স্বামীর স্মৃতি পরম ভক্তি-

শ্রদ্ধার সহিত অনুদিন তিনি পূজা করিতেন। ইচ্ছা করিয়া কখন তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি দেখিতেন না, সমবয়স্কারা বা রহস্যসম্বন্ধের কেহ দেখাইলে মুখ আরক্ত হইয়া উঠিত, চক্ষু জলে পূর্ণ হইত। একদিন এক আত্মীয়া বলিতেছিলেন যে, "কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসে (ওয়ার্ডস্-ইন্‌ষ্টি-টিউটে) থাকিতে রাজাকে কত কষ্ট করিতে হইয়াছিল, কত মাটী খুঁড়িতে হইয়াছিল (ইহা শিক্ষার বিষয় ছিল)। আহা! অত দুঃখের রাজ্য ভোগ হইল না।" শুনিয়া মার চক্ষু জলে ভরিয়া গেল।

৯

মহারাণীমাতার চরিত্রে অনন্যসাধারণ একটা সামঞ্জস্য ছিল। একাধারে তিনি জ্ঞানযোগিনী প্রবীণার প্রগাঢ় ধর্ম্মভাব এবং নিতান্ত সরলা বালিকার বিমল রহস্যপ্রিয়তার সমন্বয় করিতে পারিয়াছিলেন। শিশুদের প্রতি তাঁর আচরণ কিরূপ মধুর স্নেহময় ছিল, তাহার পরিচয় কিছু-কিছু ইতিপূর্ব্বে দিয়াছি। শৈলেশচন্দ্র যখন নিতান্ত বালক,

পুটিয়া-বঙ্গবিদ্যালয়ের ছাত্রদের লইয়া প্রতিবৎসর সরস্বতীপূজা করা তাহার একটি কাজ ছিল। মহারাণী ইহাদের তখনকার উৎসাহ দেখিয়া ভারি আনন্দলাভ করিতেন। শৈলেশ চাঁদা-আদায়ের জন্য তাঁহার কাছে গেলে "শৈলেশের কন্যাদায় উপস্থিত" বলিয়া হাস্যপরিহাস করিতেন এবং দুইতিনদিন পরে যখন আর ছেলেদের সাধ্যে কুলা-ইত না, তখন প্রয়োজনীয় সমস্ত খরচপত্র দিতেন। কাদো-ময়দাওয়ালীর সঙ্গেই তাঁহার আমোদটা সচরাচর জমিত ভাল। কাদো অনেকদিন হইতে বাবুর বাড়ীতে ও রাজবাটীতে ময়দা সরবরাহ করিত। মহারাণীর চেয়ে সে বয়সে প্রায় দ্বিগুণ বড়। জীবজন্তুর মধ্যে "কান্তাই"কে (শতপদী বা শতপাদিকা, রাজশাহী-অঞ্চলে ইহাকে "কেন্না" বলে) তাহার বড় ভয়,—চক্ষে দেখা দূরে থাক্, কেহ সেই কর্ণজলৌকার প্রসঙ্গ করিলেও সে আতঙ্কে পাগলের মত হইত। তখন সে কি বলিত, কি করিত, তাহার কিছুই ঠিকানা থাকিত না।

পুরাতন দাসীরা ইহাতে মহা বিরক্ত হইত, তাহা-দের বিশ্বাস যে, মাকে দেখাইবার জন্য সে সেরূপ নকল করিতেছে। কিন্তু বাস্তবিকই সে ভয়ে জ্ঞান হারাইত। মহারাণী তাহাকে বড় দয়া করিতেন এবং চিরদিন সে রাজসংসারে রীতিমত প্রতিপালিত হইত। ভয় পাইলে অথবা কোনরূপ রহস্য করিলে তাহার মূর্ত্তি কেমন-একটা হাস্যকর কিম্ভূত-কিমা-কার ধারণ করিত, তিনি তাহাতে আনন্দানুভব করিতেন। কোথাও একটা "কান্তাই" দেখিতে পাইলে কাদোকে আদর করিয়া কাছে ডাকিতেন এবং আশ্চর্য্য-কিছু দেখাইবার ছলে সেখানে লইয়া যাইতেন। বেচারী কতকটা কৌতূহলবশে কতক বা সন্দেহান্দোলিত চিত্তে তাঁহার অনুবর্ত্তন করিত, তার পর "কেন্ন্যা"র উপর চক্ষু পড়িবামাত্র চীৎকার করিয়া উঠিত। মা বড় সহজে কাহারও সেবাগ্রহণ করিতেন না, কিন্তু সন্ধ্যার পূর্ব্বে বা পরে কাদো রাজবাটীতে আসিলে সহসা পদে বেদনা অনুভব করিতেন এবং কাতরভাবে তাহাকে একটু পদসেবা

করিতে বলিতেন। পা টিপিতে টিপিতে কাদো নানা গল্প জুড়িয়া দিত, কিন্তু মার পদাঙ্গুলির অবকাশপথে করসঞ্চালন করিতে আরম্ভ করিয়াই কিসের স্পর্শে ভয়ে লাফাইয়া উঠিত! সে আর কিছুই নহে, দেখা যাইত মহারাণী ছোট ছোট কদলীপত্রের নল প্রস্তুত করিয়া অঙ্গুলিতে লুকাইয়া রাখিয়াছেন। কাদো তাহা "কেন্ন্যা" ছাড়া আর কিছু হইতে পারে, এমন ভাবিতেই পারিত না। এই জীববিশেষের বিভীষিকার সঙ্গে তাহার আরো দুই একটা উপসর্গ ছিল, যেমন তোৎলামি, এবং এক কথা বলিতে গিয়া নিজের অজ্ঞাতে অন্য কথা বলা। মহারাণীকে সচরাচর সে বলিত "মা জননী।" কিন্তু যদি বলিতে ইচ্ছা করিত "মার শ্রীচরণে প্রতিপালিত হইতেছি," বলিয়া ফেলিত "মা আমার শ্রীচরণে" ইত্যাদি! তাহার এই সব কথা শুনিতে ও বলিতে তিনি ভালবাসিতেন। একদিন এক আত্মীয়া বলিতেছিলেন যে, মা আগে আমোদ করিয়া কাদোর পাদধূলি লইতেন। মা হাসি-

লেন। কাদো বলিল, "তাই ত আমার কপালে এত দুঃখ।" সেই আত্মীয়া মহারাণীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "বাস্তবিক কর্ত্তা, আপনি কাশী-প্রয়াগের কথা ছাড়িয়া কেন কাদোকে পূজা করেন না?" মা হাসিলেন, বলিলেন, "সত্য কাদো, তুমি কোন উচ্চস্থানে বসিয়া থাক!" এই সব কথায় তাহার মূর্ত্তি বড় হাস্যজনক হইয়া উঠিত।

পিত্রালয়ে গেলে মহারাণী ঠিক বালিকার মতই ব্যবহার করিতেন। একদিন সেখানে প্রাতে তাঁহার কাছে বসিয়া আছি, ভৃত্য আসিয়া কয়জনের হাজিরী জানাইল। তাঁহার শরীর তখন অসুস্থ, কবিরাজমহাশয়ও দেখিতে আসিয়াছিলেন। সহজে চিকিৎসকের নিয়মাধীন হইতে তিনি কখন ভাল-বাসিতেন না, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ভৃত্য ত্রৈলোক্যকে বলিলেন, "আমায় বিরক্ত করিও না। দরবারের কথা এ বাড়ীতে কেন?"

আর একদিন পিত্রালয় হইতে ফিরিয়া হাসিতে হাসিতে মা গল্প করিতেছিলেন যে, ও-বাড়ী গিয়া

কামরাঙা, আমড়া ও হরিফল খাইয়াছিলেন! হাস্যের উদ্দেশ্য, রাজবাটীতে অসুখের সময় এ স্বাধীনতা থাকার সম্ভাবনা ছিল না! আমায় বলিলেন, "হরিফল তুমি বুঝিবে না তোমাদের দেশে নাকি নেওয়ার বলে!" আমি সুধাইলাম, তিনি জানিলেন কিরূপে? মা উত্তর করিলেন, "সে-বার কলিকাতায় গিয়া কুরুর (ও-বাড়ীর কোকনের) হাম হইয়াছিল। প্রতিবেশিনী কয়জন বৃদ্ধা আসিয়া উহারই ডাল দিয়া ঝাড়িতে বলিয়াছিল। প্রথমে বুঝিতে পারি নাই, পরে বুঝিয়াছিলাম।" আমি বলিলাম, "আমাদের বাসায় একটা আমড়াগাছ আছে।" মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, তার আমড়া মিষ্ট?" আমি হাসিলাম—"তা ত বলিতে পারি না।" মাও হাসিলেন। সেদিন চারি-আনির বাড়ীতে ত্রৈলোক্যকে দিয়া মহারাণী কতকগুলি শাকসবজী পাঠাইয়াছিলেন। ত্রৈলোক্য ফিরিলে কৌতূহলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি কি জিনিষ দেওয়া হইল, কি তাঁহারা বলিলেন," ইত্যাদি।

লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্ণর টম্‌সন্‌সাহেবের রাজশাহী পরিদর্শনের কিছুদিন পূর্ব্বের কথা। পিতৃদেব তখন পেন্‌শন্‌ লইয়াছেন। আমরা শুনিয়াছিলাম রাজার মৃত্যুকালে তিনি তথায় ম্যাজিষ্ট্রেট্‌-কালেক্টর ছিলেন। মহারাণী বলিতেছিলেন, "ইনিই যদি তিনি হন, তবে আমার কাছে তাঁহার কতকগুলি পত্র আছে। এই সাহেবই চেষ্টা করিয়াছিলেন, যাহাতে বিষয় কোর্ট অব্‌ ওয়ার্ডসে না যায়। তিনি আমাদের কথা সব জানেন। যদি জিজ্ঞাসাপত্র করেন, তবে এমন পুরাণ লোক ষ্টেটে এখন কেহ নাই যে, উত্তর দিতে পারে। অবশ্য দেওয়ানজি সব জানেন।" আমি সেই কাগজপত্র গুলি একবার দেখিতে চাহিলাম। কিন্তু সেদিন মোহর ও পুরাতন কাগজাদির রক্ষক ঈশান সেন মহাশয় না আসায় দেখা হইল না। বেলা অধিক হইল, আমরা উঠিলাম। মাও আমাদের সঙ্গে হলে আসিলেন। সিঁড়িতে কাদো আমায় বলিতেছিল, "আমায় কতকগুলি আমড়া দিবেন ত?" মা

শুনিয়া তাহার সঙ্গে বালিকার মত রহস্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

ঐ বৎসর শ্রাবণমাসের শেষে হঠাৎ কুমারের ইচ্ছা হইল, মহারাণীমাতাকে সঙ্গে লইয়া শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করিবেন। মা সে তীর্থ পূর্ব্বেই দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা ছাড়া, কতকগুলি কারণে সহসা সে ভাবে পর্য্যটনে বাহির হওয়া বাঞ্ছনীয় জ্ঞান করেন নাই। কিন্তু কুমারকে বুঝাইয়া-সুঝাইয়া নিবৃত্ত করিতে পারিতেছিলেন না। কথাটা ২।৪ দিনে প্রকাশ হইলে তাঁর আশ্রিতদের কেমন আশঙ্কা জন্মিল, তিনি শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিতে চলিলেন, আর ফিরিবেন না। তাহারা তাঁহাকে সহস্র প্রকারের প্রশ্ন করিয়া এবং কাঁদিয়া-কাটিয়া আকুল করিয়া তুলিল। কাদোও কাঁদিতেছিল, কিন্তু তাহার ভাষা মনের ভাব প্রকাশে বাদ সাধিতেছিল। মা না হাসিয়া থাকিতে পারিলেন না, বলিলেন, "ঘোর দুঃখেও তোমার কথায় হাসি পায়!"

অবগাহনস্নান চিরদিন মার বড় প্রিয় ছিল। গঙ্গা-সাগরস্নানে গিয়া কয়দিন প্রথামত আত্মীয়স্বজনদের স্মরণ করিতে করিতে এত ডুব দিয়াছিলেন যে, তাহাই তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গের প্রথম কারণ বলিয়া অনুমিত হয়। বড় অসুখের সময় এই স্নান বন্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াও চিকিৎসকমহাশয়েরা সর্ব্বদা সফল মনোরথ হইতেন না। কবিরাজের হাত দেখা শেষ হইলেই দাসী তাঁর শিক্ষামত বলিত, "আজ স্নান করিবেন ?" কবিরাজ মহাশয় বারংবার নিষেধ করিয়া উত্তর পাইতেন "গরম জলে আজ স্নান করিব, কাল আর করিব না।" তাঁর অসুস্থাবস্থায় একদিন শুনিলাম যে, মা আজ পুস্করিণীতে স্নান করিবেন। আমি বলিলাম "উহাতে অসুখ করিবে যে ?" মা সে কথা হাসিয়া উড়াইলেন। চাকরাণীরা বলিতে লাগিল, "অনেকক্ষণ জলে থাকা হয়, সহজে মা উঠিতে চান না।" মা বলিলেন, "বেশ ত আমোদ, জলে খুব আরাম পাই। বোধ হয়,জলের উপর বেশ ঘুমান যায়।"

একদিন বধূরাণীর অলঙ্কারগুলি আমরা সকলে দেখিতেছিলাম। মহারাণীমাতার এক ঠাকুরাণী-দিদি তাহা দেখিতে চাহিলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম, "দেখুন, আপনাদের সময় এসব ছিল না। দেখুন, দেখিয়া আবার এখনকার বউ হইতে সাধ যায় কি না?" তিনি সে সব দেখিয়া চলিয়া যাইতে-ছিলেন। মা, হাসিলেন, বলিলেন, "ঠাকুরমা, দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিলেন যে!"

তাঁহার চক্ষুলজ্জা বড় বেশী জানিয়া স্বার্থপর লোকেরা অনায়াসে আপনার কার্য্য সিদ্ধ করিয়া লইত। মা সব বুঝিতেন, কিছু বলিতে পারিতেন না। একদিন বলিতেছিলেন যে "যদি প্রয়োজন-বশত কখন কোকার তহবিল হইতে টাকা আনাইয়া লই, এক দিয়া কর্ম্মচারী আর লিখিয়া রাখে। জানিয়াও শেষে লজ্জায় আমি আর কিছু বলিতে পারিনা। উৎসব সরকারের শাশুড়ী পাগল হইয়া বলিয়াছিল, 'সবারও কথা নয়, কবারও কথা নয়।' পাগল

মানুষ, কথা বলিয়াছিল ভাল। আমারও তাই হয়েছে।"

১২৮৯ সালের আশ্বিন মাসে একদিন বেলা যখন প্রায় সাড়ে এগারটা, ত্রৈলক্য মাকে জানাইল, প্রধান কর্ম্মচারীদের কেহ কেহ বাহিরে আসিয়াছেন, মাকে একবার কাছারীতে বসিতে হইবে। হাতের কাজ শেষ করিয়া মহারাণী একটু হাসিলেন। এবং বলিলেন, "চল, হাজিরী দিয়া আসিগে!"

৩রা কার্ত্তিক পূজার সময় কলিকাতা যাওয়ার দিন রাত্রি প্রায় চারিদণ্ড পর্য্যন্ত কুমার গোপালেন্দ্র-নারায়ণ সহ মহারাণীমাতার নিকট উপস্থিত ছিলাম। একজন কর্ম্মচারীকে বিশেষ প্রয়োজনবশত ডাকিতে পাঠান হইয়াছিল। সংবাদ আসিল, তার জ্বর হইয়াছে—আজ কোনও প্রকারে আসিতে সে অক্ষম। মা হাসিলেন, বলিলেন, "আজ সময় ভাল নয় বুঝি?" পরে বলিলেন "* * ডাক্তার মদ খাইলে ঐ কথা বলিয়া পাঠাইত!"

একদিন ও-বাড়ীর একজন পুরাতন কর্ম্মচারীর

সঙ্গে কোন আত্মীয়া গল্পচ্ছলে বলিতেছিলেন যে, "মা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, পিত্রালয়ের ভাগ্য ফিরিল, যাই তাঁহার জন্ম হইল।" কথাটা মহারাণীর কানে গেল। হাসিয়া তিনি বলিলেন, "লক্ষ্মীই বটে, যেখানে গিয়াছি, সেইখানেই সব উড়িয়া গিয়াছে।"

১০

কথাপ্রসঙ্গে একদিন আমি মহারাণীমাতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, প্রথমে তিনি কি কি পুস্তক পড়িয়াছিলেন ? উত্তর—"কাদম্বরী", "মনঃশিক্ষা", আর "মহাভারত।" "মনঃশিক্ষা" আমার দেখা ছিল না, পুনশ্চ সুধাইলাম, "সে বই পড়িয়া আপনার অনেক উপকার হইয়াছিল ?" মা বলিলেন, "তাহাতে মনের প্রতি অনেক উপদেশ আছে। তুমি পড়িবে ? আচ্ছা, আমি খুঁজিয়া দিব।"

রাজার দূরসম্পর্কীয় প্রচণ্ড মহাশয় ষ্টেটের একজন পুরাতন প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। অপ্রিয়বাদী বলিয়া তিনি কখন সর্ব্বসাধারণের অনুরাগ আকর্ষণ করিতে পারেন নাই। এবং ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে যে

ঔদার্য্য মহারাণীর চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল, তাহা তাঁহার একেবারে ছিল না। যাহা হউক, চিরদিন তিনি ষ্টেটের হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন এবং শেষবয়সে পেন্‌শন্ লাভ করিয়া কাশীতে বাস করিতেন। বালবিধবা মহারাণীমাতার ধর্ম্মানুরাগ যাহাতে অনুদিন বর্দ্ধিত হয়, পিতা ভৈরবনাথের স্বর্গারোহণের পর এই ঘোর বৈষয়িক অথচ গোঁড়া ব্রাহ্মণবৃদ্ধের সেই চেষ্টা ও যত্ন ছিল। মা সেজন্য যখন-তখন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বলিতেন, "প্রচণ্ড মহাশয় যে উপকার করিয়াছেন, তাহা কখন ভুলিবার নহে। তাঁর ঋণ শোধ হয় না।"

আমি একদিন তাঁহাকে বলিতেছিলাম যে, বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি, বঙ্কিমবাবু বড় মাতৃভক্ত, মার ইচ্ছামত সৎকার্য্যে অনেক টাকা তিনি দিয়াছেন। মহারাণী—"আজও কি তাঁর মা জীবিত?" উত্তর—"না।" এই কথায় বাল্যশিক্ষা ও সন্তানচরিত্রে পিতামাতার প্রভাবের কথা উঠিল। আমি সুধাইলাম, "আপনি আপনার পিতৃদেব এবং

শিরোমণিমহাশয়ের কাছে কি ধর্ম্মোপদেশ লাভ করিয়াছেন? উত্তর—"অবশ্য পিতৃদেবের কাছে বেশী, তবে শিরোমণিমহাশয়ের কাছেও কতক-কতক বটে।" আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, "তাঁহারা কি কাছে বসিয়া ধর্ম্মোপদেশ দিতেন? রামতনু-বাবু নিজের পুত্র কন্যা এবং আত্মীয়বন্ধুদের ঐরূপে শিক্ষা দেন।" মহারাণী বলিলেন,—"তোমার কাছে তাঁহার কথা ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছি বটে। না, সেরূপ নয়। পিত্রালয়ে সর্ব্বদা পূজা হয়,—সে সব দেখিয়াও শিখিতাম।"

সাহেবগঞ্জ ষ্টেশনে জলবায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য যখন দ্বিতীয়বার আমি যাই, তখন শীতের প্রারম্ভে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সেখানে আগমন করিয়া গঙ্গাবক্ষে বোটে কয়দিন বাস করিয়া-ছিলেন। আমি প্রায় প্রত্যহ তাঁহাকে প্রণাম করিতে যাইতাম এবং তাঁহার প্রাতর্ভ্রমণের সহচর ছিলাম। কথায়-কথায় একদিন ব্রহ্মচারিণী মহারাণী শরৎসুন্দরীর প্রসঙ্গ উপস্থিত হইল। মহর্ষি সংবাদ-

পত্রে তাঁহার দানশীলতার পরিচয় মধ্যে মধ্যে পাই-তেন কিন্তু এই রাজতপস্বিনীর আদর্শজীবনের কথা তাঁহার শ্রুতিগোচর ছিল না। আমার মুখে শুনিয়া স্মিতমুখে বলিলেন, "শরৎকুমারী নামে আমার এক কন্যা ছিলেন!" পুটিয়ায় ফিরিয়া গিয়া আমি মাতার নিকট সে গল্প করিলাম। তিনি সেই ঋষিকল্প সত্যব্রত মহাত্মার বিষয় অনেক শুনিয়াছিলেন, বিশেষত পিতৃঋণশোধের অবসরে ইদানীন্তনকালে যে ধর্ম্মবুদ্ধি এবং ত্যাগস্বীকারের দৃষ্টান্ত মহর্ষি দেখাইয়াছিলেন, শতমুখে তাহার সাধুবাদ করিতেন। আমার সাক্ষাতের কথা সবিস্তারে জিজ্ঞাসা করিলেন এবং আপনাকে তদীয় কন্যাস্থানীয়া জানিয়া উৎফুল্ল হইলেন।

সকলপ্রকার সদ্দৃষ্টান্ত ও সৎকথায় তিনি বাক্যে এবং কার্য্যে যেরূপ অনুরাগ প্রকাশ করিতেন, তাঁহার চরিত্রের মহত্ব এবং মাধুর্য্য তাহাতেই সচরাচর ফুটিয়া উঠিত। আমার কৈশোরের বন্ধু শ্রীমান্ কিশোরীমোহন চৌধুরী এখন রাজশাহীতে

একজন গণনীয় জমিদার এবং ব্যবহারাজীব। দত্তকগৃহীতা মাতার প্রতি তাঁহার ঠিক গর্ভধারিণী জননীর ন্যায় ভক্তি ও ব্যবহারের কথা আশ্রিতা ব্রাহ্মণবিধবাদের মুখে সর্ব্বদা মহারাণী শুনিতে পাইতেন এবং আমাদের সমক্ষে কতবার তাঁহাকে সুখ্যাতি করিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। আমি ছুটীর পর বোয়ালিয়ায় গিয়া কিশোরীকে সে সব কথা শুনাইতাম এবং তাহার সলজ্জমুখে উৎসাহের জ্যোতি দেখিয়া আনন্দিত হইতাম।

সাবালক হইবার কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই কুমার বৈষয়িক কার্য্য কিছু কিছু দেখিতে শুনিতেছিলেন। সেজন্য মহারাণী পূর্ব্বের মত সব ব্যাপারে জড়িত হইতে আর ইচ্ছা করিতেন না। একদিন প্রাতে অন্দরে গিয়া দেখি, আত্মীয়-স্বজন এবং পুরাতন কর্ম্মচারীদের ভিতর যাঁহারা মাতার সহিত কথা কহিতেন, এমন ৫।৬ জন পুরুষ উপস্থিত। নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা চলিতেছিল। কিছু পরে তাঁহার দূরসম্পর্কীয় এক খুল্লতাত এবং কর্ম্মচারী দস্তখৎ

করাইবার জন্য রোকড় আনিতে অনুমতি চাহিলেন। মহারাণী অস্বীকার করিলেন, কেহ কেহ অনুরোধ করিলে, বলিলেন, "আমি তাতে দস্তখৎ করিব না।" কেহ বলিল, একবার দেখিয়া দিন। উত্তর—"দস্তখৎ না করিলে দেখা না দেখা সমান।" * * * দত্ত বলিয়া বসিলেন, "কাহাকেও আজ্ঞা করুন।" মা হাসিয়া একজন বর্ণজ্ঞানহীন চাকরের নাম করিলেন। ইহাতে দত্তজী কত লোকের নাম করিল যাহারা মূর্খ অথচ মনিবের অনুগ্রহে কৃতী হইয়াছে। একটু সুযোগ পাইয়া খুল্লতাত রোকড়ে দস্তখৎ করার অনুরোধটি পুনরুক্ত করিলেন এবং ইহাও জানাইলেন যে কুমার মহাশয়ও তাহা বলিয়াছেন। মা বলিলেন, "কুমার ত আর আমার গুরুতর লোক নয় যে কথা না শুনিলে পাপ হইবে।"

ঐ দিন কথায় কথায় * * * রাণী ঠাকুরাণীর গল্প উঠিল, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর দেহ, কেবল ওষ্ঠদ্বয় ও দন্তে পারিপাট্যের অভাব বলিয়া তিনি মুখে

কাপড় দিয়া থাকেন। স্বামীর উইল সম্বন্ধে তিনি মহারাণীমাতাকে বলিয়াছিলেন যে তাঁর কাছে দুই উইল আছে, নকল ও জাল। নাবালকের লেখা বলিয়া আসলখানা সন্দেহবশতঃ কার্য্যকর নয়। মা বলিলেন "অধিকাংশ উইলই ঐরূপ।" * * রাজার উইলের কথা তুলিলেন। বলিলেন "সে উইলে একটি মাত্র অক্ষর লেখা হইয়াছিল। কিছু-দিন পূর্ব্বে তিনি শুনিয়াছেন যে মৃত্যুর অন্ততঃ ২৪ ঘণ্টা পূর্ব্বের লিখিত না হইলে উইল গ্রাহ্য হইবে না। তা একটু ভাল বটে, কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টা পূর্ব্বেই বা জ্ঞান থাকে কৈ? বলিলেন গিরিধর রায় চারি আনির উইল লিখিয়াছিলেন এখানকার উইলও তাঁহার লেখা। ভাগ্যে জায়গীরের মহাল কয়খানি লিখিয়া দিয়াছিলেন। * * ত্রৈলোক্য বলিল "সে কথা বলিয়া কাজ নাই মা!" উত্তর—"অন্যায় কথা ত বলিতেছি না। সকল উইলেই পোষ্যপুত্র গ্রহণের বিধি দেয়, ভয় কিছু নাই।" মহারাণী মৃদুহাস্য করিলেন।

কোন আত্মীয়ার পীড়া হইয়াছিল, হাত দেখি-বার জন্য কবিরাজমহাশয় অন্দরে আসিলেন, মহারাণীমাতার গৃহের এক পাট বন্ধ হইল ; সেদিকে আত্মীয়া বসিয়া হাত দেখাইবেন। মা কাছের সম্বাদপত্র তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা এবং মাসিকপত্র কয়খানি লইয়া ভিন্ন দিকে সরিয়া গেলেন,—নহিলে কবিরাজ মহাশয় দেখিতে পান। হাত দেখার কথায় গল্প উঠিল যে * * * কাছে ও সব কিছু নাই, তাঁহার সর্ব্ব শরীর ভিন্ন বস্ত্রে ঢাকা হয়, তার পর হাত দেখান হয়। মহারাণী বলিলেন "উহাতে ত দেখা যায় মানুষটা মোটা কি সরু !"

১১

শ্রাবণ মাসের প্রাতে একদিন মহারাণীমাতাকে প্রণাম করিতে গেলাম। পিতৃদেব মহাশয় সেবার পেন্‌সন্ লইয়াছিলেন, আমাদের পুটিয়াত্যাগের সময় ঘনাইয়া আসিতেছিল। নূতন চৌকীর দক্ষিণ পাড়ে আমাদের বাসা,—আমি সেই প্রকাণ্ড দীর্ঘি-কার ঠিক্ উপরে নিজের পড়াশুনার জন্য পছন্দসই

ক্ষুদ্র একটি বাংলো প্রস্তুত করাইয়াছিলাম। স্বহস্তে দুইটী রাধাচূড়ার গাছ তাহার সম্মুখে রোপণ করিয়াছিলাম, এবং কয়বৎসরের ভিতর তাহারা বেশ বড় হইয়া পত্রে-পুষ্পে বারমাস স্থানটিকে রমণীয় করিয়া রাখিত। মাতা অন্দরের স্নানের ঘাট হইতে সেই তরুচ্ছায়াচ্ছন্ন বাংলো মাঝে মাঝে দেখিতেন। আমায় বলিলেন, গাছ ও ঘর দেখিয়া তাঁহার মন কেমন করিয়াছে যে, আমরা সব ছাড়িয়া যাব। আমাদের সাংসারিক কথাবার্ত্তা কিছু-কিছু হইতেছিল, এমন সময় রাজবাড়ীর গুরুবংশীয় * * আসিলেন। মা দাঁড়াইয়া তাঁহ'কে আসন দেওয়াইলেন এবং ভক্তিভাবে প্রণাম করিলেন। তাঁহার সঙ্গে মহারাণীর "পাওনা"র কথাবার্ত্তা শেষ হইলে ঠাকুরটি আমায় "রামের বনবাস" নাটকের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। মা বলিলেন, "রামের রাজ্যাভিষেক" তাঁহার লাইব্রেরিতে আছে এবং তাহা স্কুলের পাঠ্যপুস্তক। সেবার নৃসিংহবাবু যখন নিজের পুস্তক পাঠান, শশিবাবুও নিজের বইগুলি

পাঠাইয়া ছিলেন। এই সময় মহারাণী মাঝে মাঝে অশ্রিতা বিধবাদের বই পড়িয়া শোনাইতেন। আমি এই কথোপকথনের অবসরে তাঁহার নিকটে উপবিষ্ট * * দেবীকে সুধাইলাম, এ কয়দিন মার কাছে কি কি পুস্তক শুনিলেন? মহারাণী একখানি পৌরাণিক নাটকের নাম করিলেন। আমি "সুরুচির কুটীরে"র কথা তুলিলাম, তিনি তাহার প্রশংসা করিয়া বলিলেন, লাইব্রেরিতে খুঁজিয়া দেখিয়াছেন, ভাল ভাল অনেক বই নাই। বাহিরে কুমার মহাশয়ের কাছে অনেক পুস্তক চলিয়া গিয়াছিল, আমি অনিয়া দিতে চাহিলাম। মা প্রথমে সম্মত হইলেন, কিন্তু যেন একটু কুণ্ঠিতভাবে, তারপর আবার বলিলেন, না "কাজ নাই।" আমি জানিতাম, পাঠাগারের সযত্নসংগৃহীত এবং বাঁধান বইগুলি তাঁর শোণিততুল্য প্রিয়। কিন্তু এখন সকলই ত্যাগ করিয়া তীর্থবাসে যাইতে প্রস্তুত হইতে ছিলেন।

যে ঠাকুরাণীটির কথা কয়বার বলিয়াছি, তিনি অনেক সময় মহারাণীমাতার কাছে বসিয়া থাকি-

তেন। একদিন একটি স্ত্রীলোক মার কাছে কি প্রার্থনা করিতে আসিয়া অন্যের কথা জানাইতে-ছিল। শুনিয়া ঠাকুরাণী বলিতেছিলেন, নিজের কথা থাকে ত কর্ত্তাকে বল, অন্যের কথা বলিয়া কেবল উঁহাকে মিছামিছি বিরক্ত করা হয়। মা হাসিলেন, বলিলেন, "কোকন বলে, নিজের দেনা আগে শোধ দেন। সত্য কথা! চুপ করিয়া থাকি।" একদিন কিছু বেলা হইলে রাজান্তঃপুরে গিয়া দেখি, তিনি কিছু চিন্তাযুক্ত। কোন সরিকের পোষ্যপুত্রের আজ যাগ। নিমন্ত্রণ হইয়াছে, যাওয়া উচিত কি না, মা তাহারই পরামর্শ ও মীমাংসায় ব্যস্ত। বলিলেন, "অন্যান্য তরফেরা বলেন যে, উইল প্রকৃত নহে। সুতরাং দত্তকপুত্র নহে, পালিত! তাঁহারা তাহার সহিত একাসনে বসিবেন না। * * রাণী কাল নিজে আসিয়াছিলেন, তাঁহারও ইচ্ছা যে, যাওয়া না হয়। বরং যাগের পর অপ-রাহ্নে গেলেই হইবে।" শেষে সিদ্ধান্ত হইল, যখন উহা লইয়া কথা উঠিয়াছে, তখন যাওয়াই কর্ত্তব্য।

মহারাণী বলিতে লাগিলেন, "প্রথমে যে উইল হয়, নাবালকী অবস্থার বলিয়া সন্দেহবশত তাহা বাহির করা হইতেছে না। শুনিতেছি, শেষের উইলও রেজেষ্টারি করা হয় নাই। পাঁচশ টাকা জরিমানা দিলে রেজেষ্টারি হইবে। এরূপ অবস্থায় দত্তকপুত্র টিকিবে বোধ হয় না, একটা সাক্ষীতে হয় ত পড়িতে হইবে।" আমার প্রশ্ন মতে বলিলেন যে, "শেষ উইলখানি অন্যের স্বার্থে পূর্ণ, অনেকগুলি টাকা তদনুসারে মাসহারা দিতে হয়। কন্যার প্রাপ্য মাসিক কেবল দশটি টাকা!" আমি কহিলাম, "দেখুন, কত ভুল। নিজের সন্তান থাকিতে অন্যকে আনা কেন? পোষ্যপুত্র প্রায় ভাল হয় না। বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে আমার একদিন সে কথা হইয়াছিল, তিনিও তাই বলিয়াছিলেন। লোকে নাম রাখিবার জন্য এ সব করে, সৎকীর্ত্তির দ্বারা নাম রাখিলেই ত হয়। সেই টাকায় একটা স্থায়ী কাজ কিছু হইতে পারে। নহিলে নিজের সন্তান দিয়া অনেকের মুখ অন্ধকার হয়, পরের ছেলে ত দূরের

কথা।” মহারাণী স্মিতমুখে বলিলেন, “সত্য কথা।” কিন্তু তখনই আবার গম্ভীর হইলেন। উইলের কথা চলিতে লাগিল। কেহ বলিল, “অন্তিমকালে যে সব উইল লিখিত হয়, তাহাতে লেখকেরা স্বার্থ-সিদ্ধি করিয়া লয়। কিন্তু আমাদের রাজবাড়ীর উইলে তেমন কিছু হইতে পায় নাই।” মাতা কহিলেন, উইল গিরিধর রায়ের লেখা, একটিমাত্র অক্ষর তাহাত লিখিত হইয়াছিল।” আমি বলিলাম “তাহাতে ডাক্তার সারকোর সাহেবের দস্তখত আছে। সে সব কথা আমাদের আত্মীয় বহরম-পুরের বৈকুণ্ঠবাবুর কাছে শুনিয়াছি, সাহেব তাঁহার কাছে গল্প করিয়াছিলেন। গিরিধর রায় মহাশয়ের কাছে শুনিয়াছিলাম, বোয়ালিয়ার জোড়া-বাংলোর রাজা পরলোকগমনের কিছুমাত্র পূর্ব্বে তাঁহাকে উইল লিখিতে আদেশ করেন এবং বারংবার বলেন, দেখিও, ধর্ম্ম ভাবিয়া কাজ করিও। শেষে স্বাক্ষর করিবার সময় রাজার হাত এতই দূর্ব্বল হইয়া পড়িল যে J-অক্ষরটি ছাড়া আর কিছুই লিখিতে পারিলেন

না। বাকীটা লিখিবার জন্য তিনি ডাক্তার সার-কোরকে অনুরোধ করিলেন। ডাক্তার তাহা পালন করিতে উদ্যত হইলে রায়মহাশয় মহা আপত্তি করিয়া বসিলেন, এবং বলিলেন, সাহেব, আপনি সাক্ষিস্বরূপ দস্তখৎ করুন। তাহাই হইল। ডাক্তার সাহেব এখনও সর্ব্বদা আপনার সংবাদ লইয়া থাকেন!" এই কথাপ্রসঙ্গে মাতাকে আমি সুধাইলাম, সে সময়ে তাঁহার বয়ঃক্রম ১৪।১৫ হইবে? মা বলিলেন, "অত হইবে না। দেওয়ান তখন কলিকাতায় কি মুর্শিদাবাদে ছিলেন।"

দত্তকপুত্রের কথায় মহারাণী বলিতেছিলেন যে, "৪।৫ বৎসর হইল, একজন মুসলমান প্রজা এই বলিয়া নালিশ করে যে, তাঁহার মোকদ্দমা চালাইবার অধিকার নাই। হাইকোর্ট বিচার করেন, আছে। দেখাদেখি আরো একজন প্রজা ঐরূপ করিয়াছিল। * * উইলসম্বন্ধে অনেকে গোলে পড়ে, আমার সে সব কিছু হয় নাই। আমি যখন ইচ্ছা, তখনই পোষ্যপুত্র লইতে পারিতাম। গোত্র

লইয়া তর্কবশত কোকার যাগের কিছু দেরি হইয়াছিল।” স্বগোত্র বলিয়া কয়জনের দত্তক অসিদ্ধ হইয়াছে, সে গল্প করিলেন। বলিলেন, পিতামাতা টাকা লইলেও তাহা হয়, কিন্তু তা প্রমাণ করা সহজ নহে। টাকা লওয়ার কথায় বলিলেন যে, “ধর্ম্মেও বটে, লৌকিকতাতেও বটে, উহা বড় পাপ।”

পোষ্যপুত্রের চরিত্র নিজের আদর্শে গঠিত না হওয়ায় মহারাণী ইদানীং বড় মনঃকষ্টে থাকিতেন। তাঁহার সুশিক্ষাবিধানের জন্য যত্ন এবং চেষ্টার কোন ত্রুটি হয় নাই। কুমারের বয়স যখন ৮।৯ বৎসর মাত্র, তখনই মাতা বিদ্যাসাগরমহাশয়কে একজন সুশিক্ষক নির্ব্বাচন করিয়া পাঠাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন এবং তদনুসারে সংস্কৃত-কলেজের বি, এ, উপাধিধারী রাধারমণ সেন মহাশয় কলিকাতা হইতে প্রেরিত হন। ইনি আমাদের স্বগ্রামবাসী আত্মীয় এবং ভূতপূর্ব্ব কাশ্মীররাজবৈদ্য হারাধন সেন মহাশয়ের মধ্যমপুত্র

ছিলেন। কবিরাজমহাশয়ের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সম্প্রীতি ছিল এবং শেষোক্ত উপযুক্ত বন্ধুপুত্রদ্বয়কে—স্বনামখ্যাত কবিরাজ ব্রজেন্দ্রকুমার এবং রাধারমণবাবুকে—পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। তাঁহাদের জোড়াসাঁকো রতন সরকারের গার্ডন্-ষ্ট্রীট্স্থ বাসায় পণ্ডিতপ্রবরকে অনেক সময় দেখা যাইত। এক দিনের গল্প বলি। রাধারমণবাবুর ৪।৫ বৎসরের এক পুত্র একদিন মধ্যাহ্নে বাসার প্রাঙ্গণে খেলা করিতেছে, এমন সময়ে বিদ্যাসাগর-মহাশয় আসিয়া উপস্থিত। তিনি ছেলেটিকে পূর্ব্বে কখন দেখেন নাই, কিন্তু তাহার চেহারা দেখিয়াই সুধাইলেন—"তুই রমণের ছেলে—নয়?" চটিজুতাপরিহিত অর্দ্ধমুণ্ডিতমস্তক এক ব্যক্তিকে সেভাবে প্রশ্ন করিতে দেখিয়া শিশুর আত্মাভিমান ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। সে গম্ভীর অথচ তাচ্ছীল্যভাবে কেবল একটা "হুঁ" জোরে উচ্চারণ করিল। কিন্তু বিদ্যাসাগর ছাড়েন না। "কি পড়িস্?" উত্তর—"দ্বিতীয় ভাগ।"

প্রশ্ন—"দুতীয় ভাগ! আচ্ছা, বানান কর্‌তো নৃত্য।" ছেলেটি শুদ্ধরূপে বর্ণবিন্যাস করিলে তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"বল্ তো, নৃত্য মানে কি?" "কেন, নাচা-গাওয়া।" প্রশ্ন—"বলিস্ কি রে, নাচা-গাওয়া, দুইই?" বালক ভারি চটিয়া বলিল, "নাচা, গাওয়া, আরো কত কি হয়! তুই উড়ে, তুই তার বুঝ্‌বি কি?"

এই শিক্ষক দীর্ঘকাল কুমারের অধ্যাপনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে বিশেষ উপকার হয় নাই। লেখাপড়ায় কুমারের আদৌ মতিগতি ছিল না, কবুতরের পাল ও রাজ্যের যত দুষ্ট ছেলে পোষণ কোমল বয়স হইতেই তাঁর প্রিয়কার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল। রাধারমণবাবু নির্দ্দিষ্ট সময়ে পড়াইতে আসিতেছেন, বালক অনুচরদের অম্‌নি ডাক বসিয়া গেল এবং তাহাদের শিস্ শুনিয়া কুমার পূর্ব্ব হইতে সতর্ক হইয়া গেলেন। শিক্ষকমহাশয় যখন এ সব বুঝিতে পারিলেন, তখন আর প্রতিবিধানের উপায় ছিল না। সে যাহা হউক, দুষ্ট ছেলেদের

সংসর্গে মিথ্যাচরণ রাজকুমারের কিরূপ অভ্যস্ত হইয়াছিল, একটি গল্পে তাহা বেশ বুঝা যাইবে। বাহিরে বৈঠকখানার ছাদে তাঁর পারাবতসকল থাকিত, এবং তাহাদের উড়াইয়া আমোদ করিবার যে সব অনুপানের দরকার, তাহার কিছুরই অপ্রতুল সেখানে ছিল না। একদিন তিনি তন্ময় হইয়া কবুতর উড়াইতেছেন, হঠাৎ একটা খোঁচা চক্ষের অতি নিকটে লাগিয়া রক্তপাত হইল। সে কথা গোপন করিবার জন্য কুমার মহারাণীকে বলিলেন, "মা, চারি-আনির ক্ষ্যাপা বানরটা আমার চোখে হাঁচড় মারিয়াছে।" এ কথা অবিশ্বাস করার কোন কারণ ছিল না। মহারাণী অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইলেন। লোকে বলিল, ক্ষ্যাপা বাঁদর দংশন করিলে ফল বড় ভয়ানক হয়,—তাহাকে মারিয়া তার উপর স্নান করিলে তবে দোষ কাটিতে পারে। চাকরদেব ভিতর অনেকেই ভিতরের কথা জানিত না, তাহারা সেই নির্দোষ শাখামৃগের জীবনান্ত করিয়া প্রভুপুত্রকে তদুপরি স্নান করাইল। অন্যান্য

যে সকল ব্যবস্থা ব্রাহ্মণপণ্ডিতমহাশয়েরা করিলেন, তাহা আচরণেরও কোন ত্রুটি হইল না কিছুদিন পরে আসল কথা প্রকাশ পাইল। তখন মহারাণী শাস্ত্রসম্মত প্রায়শ্চিত্তাদি করিতে বাধ্য হইলেন।

ফলত পোষ্যপুত্রকে তিনি যেরূপ স্নেহ করিতেন, সচরাচর গর্ভজাত পুত্রও তাহাতে আদুরে হইয়া উঠে। কুমারের মাতৃশাসন প্রথম হইতে কঠোর হইলে সঙ্গদোষ ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না। যাহা হউক, তিনি কিশোরবয়সে পদার্পণ করিতে না করিতে মহারাণীর ন্যায় সকলেরই ধারণা হইল যে, সংসর্গদোষের অনিবার্য্য কুফলসকল ফলিতে বড় বিলম্ব নাই। তখন সকলেই কিছু সতর্ক হইলেন। বেগতিক দেখিয়া কুমারের ছোট-বড় সহচরেরা তাঁহাকে দিনকতকের জন্য পলায়ন করিতে পরামর্শ দিল।

১২

কুমারের পলায়নঘটনা—সে আজ ২৮।২৯ বছরের কথা, কিন্তু যেন কাল বলিয়া মনে হইতেছে। সে-

দিন পুটিয়ায় বড় দুর্দ্দৈব উপস্থিত। চারি-আনির রাজা পরেশনারায়ণ অন্তিমশয্যায় অজ্ঞান—তাঁহাকে গোবিন্দজীর বাটীতে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। তথায় প্রাঙ্গনস্থ নাটমন্দিরে চিকিৎসক ও কর্ম্মচারি-গণে পরিবৃত হইয়া সমস্ত রাত্রি কোনরূপে তাঁহার কাটিয়াছে। নাটমন্দিরের দুইদিকে রাজমাতা ও বধূরাণীর পট্টাবাস পড়িয়াছে, তাঁহারা বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে থাকিয়া রাজার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে-ছেন। প্রত্যূষে পিতৃদেবমহাশয়ের সঙ্গে সেখানে গেলাম। স্বর্গীয় পিতামহ পরেশনারায়ণের নাবা-লকী অবস্থায় কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের অধীনে তাঁহার অছি-ম্যানেজার নিযুক্ত হন—এবং তিনি দেহত্যাগ করিলে পিতাঠাকুর মহাশয় প্রথমে সেই কার্য্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে পাঁচ-আনির ষ্টেট্ও তাঁহার হস্তে অর্পিত হইয়াছিল। অতএব রাজা যোগেন্দ্র-নারায়ণের মত রাজা পরেশনারায়ণ রায়ও আবাল্য তদীয় স্নেহপ্রীতির পাত্র ছিলেন। পরেশনারায়ণের জেষ্ঠভ্রাতা বাল্যে স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন, পিতৃ-

দেবের নামে তাঁহার নাম। রাজমাতা সেইজন্য তাঁহাকে পুত্রসম্বোধন করিতেন এবং চিরদিন সন্তান-বৎ তাঁহার হিতাকাঙ্ক্ষিণী ছিলেন। রাজার পীড়া-বৃদ্ধি হইলে পিতৃদেবমহাশয়কে অধিকাংশ সময় কয়দিন চারি-আনির বাটীতে কাটাইতে হইয়াছে।—এই প্রভাতে রাজার শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া তিনি অশ্রুমোচন করিতেছিলেন। রাজমাতা পর্দ্দার অন্তরালে থাকিয়া তাঁহাকে মর্ম্মভেদী করুণকণ্ঠে বারংবার বলিতেছিলেন—"বাবা, পরেশকে বাঁচাও!" এই শোকের দৃশ্য আমি সহ্য করিতে পারিতে-ছিলাম না। সহসা পাঁচ-আনির বাড়ীর বক্‌সীমহাশয় দ্রুতপদে আসিয়া পিতাঠাকুরমহাশয়ের সঙ্গে আমা-কেও একটু একান্তে লইয়া গেলেন এবং সংবাদ দিলেন, কুমার রাত্রে কোথায় পলায়ন করিয়াছেন। আমরা তাড়াতাড়ি রাজবাটীতে গিয়া দেখি, হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছে, একটি অনুচরমাত্র সঙ্গে তিনি কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। যাহারা সর্ব্বদা কাছেকাছে থাকিত, তাহারাও ঘুণাক্ষরে জানিতে পারে নাই।

অন্দরমহলে প্রবেশ করিয়া দেখি, মাতা শোকেদুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়াছেন। তিনি বলিতেছিলেন, "আমার কাছে স্নেহযত্নের ত্রুটি হইয়াছে,—নহিলে কোকা এভাবে যাইবে কেন?" তৎক্ষণাৎ আদেশ হইয়া গেল, চারিদিকে লোকজন পাঠাও, অর্থের মায়া করিও না। দেখিতে দেখিতে নানা স্থানে কর্ম্মচারীরা ও ভৃত্যবর্গ চতুর্দ্দিকে বাহির হইয়া গেল। মহারাণীমাতার ইচ্ছামত আমি নাটোর ষ্টেশনে গিয়া যেখানে যেখানে কুমারের গমন সম্ভব, সর্ব্বত্র 'তার' দিলাম। তার পর অপরাহ্নের ট্রেণে কলিকাতায় গিয়া পরদিন সেখানে অনুসন্ধান আরম্ভ করিলাম। দুইদিনের পর তার যোগে খবর পাওয়া গেল, আত্রাই ষ্টেশনের নিকটে কুমারকে পাওয়া গিয়াছে। আবার তার দিবার ও সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন প্রত্যাহার করিবার পালা আমারই। উত্তরে দারজিলিং পশ্চিমে বেনারস পর্য্যন্ত প্রায় প্রত্যেক ষ্টেশনে রাজবাটীর লোক খবরের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। রাজধানীর ইংরাজী-বাঙলা সংবাদ-

পত্রের আপিসে আপিসে ঘুরিয়া-ঘুরিয়া বিজ্ঞাপন তুলিয়া লইলাম—কিন্তু মফস্বলে তারযোগে সে কাজটা ভাল সম্পন্ন হইল না। তাহর ফলে, ২।৩ খানি প্রাদেশিক কাগজে পরদিন পলায়নের খবরটা বাহির হইয়া পড়িল।

কুমার ফিরিয়া আসিলে মহারাণীমাতা বুঝিতে পারিলেন, কি উদ্দেশ্যে এবং কাহাদের পরামর্শে তিনি গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু চক্ষুলজ্জায় তিনি কাহাকেও কিছু বলিতে পারিলেন না। কুমার অধিকতর আদুরে হইয়া উঠিলেন—তাঁহার সঙ্গীদেরও সাহস বাড়িয়া গেল। প্রধান কর্ম্ম-চারীরা কঠোর শাসনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিলে কি হয়, মাতার স্নেহাতিশয্যে কেহ কিছু করিতে পারিলেন না। অন্য এক সরিকের প্রবীণা রাণীঠাকুরাণী বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, "পোষ্যপুত্র বিগ্‌ড়াইতে বসিয়াছে, তার জন্য অত মায়া কেন?" মহারাণী উত্তর করিলেন, "যদি গর্ভজাত ছেলে হইত—কি করিতাম?"

মহারাণী এই সময়ে যে ভ্রম করিয়াছিলেন, পরে তাহার আর অপনোদন হইল না এবং চিরদিন সেজন্য তাঁহাকে ভুগিতে হইয়াছিল।

সেই অবধি কুমারের ভয় একেবারে ভাঙিয়া গেল। যখন-তখন তিনি মহারাণীমাতাকে নামমাত্র জানাইয়া সদলবলে বাহির হইয়া পড়িতেন, এবং এরূপ নিষিদ্ধ কাজে হাত দিতেন, যাহাতে মাতার মর্ম্মপীড়া অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিত। একদিন খবর পাওয়া গেল, নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামের বারোয়ারি তলায় রাজবাটীর তাঁবু খাড়া হইয়াছে। স্থানটার তেমন সুনাম ছিল না। কুমারের সহচরদের ভিতর দুইএকজন বয়োবৃদ্ধও ছিল। একজন রাজার আমলের লোক, রাজান্তঃপুরে তাহার প্রবেশাধিকার ছিল এবং মহারাণীমাতা তাহাকে লজ্জা করিলেও সে সম্মুখে আসিতে পাইত। শিবিরসংস্থাপনের জনরব প্রচারিত হইতে না হইতে সেই ক্ষুদ্রকায় প্রবীণ ব্রাহ্মণ মাতাকে জানাইল, তাহারা সকলে ** গ্রামে যাইবে। মা জিজ্ঞাসা করাইলেন, কুমারশুদ্ধ না কি?

সে বলিল, না। মা আবার বলাইলেন, সেখানে কোকনের গিয়াই কাজ নাই, গেলে লোকে নিন্দা করিবে। বৃদ্ধটি কথার ছলে মহারাণীর অভিপ্রায় বুঝিতে আসিয়াছিল, মা তাহা উপলব্ধি করিয়া স্পষ্ট কথায় নিষেধ করিলেন। ইহাতে সে কিঞ্চিৎ রাগিয়া গেল। বলিল, "বারোয়ারি কোথায় না হয় ?" তার পর কত উদাহরণ দিল। আমরা মার কাছে বসিয়া ছিলাম, বুড়ার ধৃষ্টতায় ভারি বিরক্তি-বোধ হইতেছিল। সে আপন মনে বকিয়া বকিয়া শেষে চলিয়া গেল। মা তখন অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া তাহার পিছুপিছু লোক পাঠাইলেন এবং বলিয়া দিলেন, যে কথা হইয়াছে, তা কুমারকে যেন বলা না হয়। পরে আমাদিগকে বলিলেন, "কেনই বা বলিলাম !"

আর একদিন এই ব্রাহ্মণটি আসিয়া মার কাছে জানাইল, কোন লোকের পিতৃশ্রাদ্ধে কিছু সাহায্যের প্রয়োজন। মা আমার দ্বারা বলাইলেন, কোকনকে জানান হউক, তিনি সে সব কিছুতে আর হাত

দেন না। ব্রাহ্মণ তথাপি ছাড়ে না, জেদ্ করিতে লাগিল। কিন্তু মহারাণী শুনিলেন না। সে চলিয়া গেলে আমায় বলিলেন, "কোকা হুকুম দিয়াছে, দুই টাকার বেশী আর দান হইবে না।"

দূরদেশভ্রমণের ইচ্ছা হইলে কুমার ইদানীং মহারাণীমাতাকে সঙ্গে যাইবার জন্য জেদ্ ধরিতেন, তাঁহার ইচ্ছা-অনিচ্ছা বিবেচনা করিতেন না। একদিন প্রাতে মার কাছে শুনিলাম, গতরাত্রে কুমার প্রস্তাব করিয়াছেন যে, মাকে শ্রীবৃন্দাবন যাইতে হইবে, তিনিও সদলবলে যাইবেন। তীর্থ-বাসের জন্য মহারাণীমাতা সর্ব্বদাই প্রস্তুত, কিন্তু সেভাবে যাইতে আদৌ ইচ্ছুক ছিলেন না। তিনি কুমারকে বলিয়াছিলেন, তাঁর যেরূপ অভ্যাস হইয়াছে, অনায়াসে মাকে ফেলিয়া সদলে আজ পাঞ্জাব, কাল বোম্বে বেড়াইতে যাইবেন। আরো অনেক আপত্তি তিনি তুলিয়াছিলেন, কিন্তু কুমার হাতেপায়ে ধরিয়া নিরস্ত করিয়াছেন। এই সব কথা হইতেছে, এমন-সময় কুমার স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত। আমার এবং

সান্যালমহাশয়ের দিকে তাকাইয়া মা বলিলেন, "কোকনের যাহা দোষ, তাহা বলি। এখানে যেমন, সেখানে সেইরূপ মাঝে-মাঝে পলাইলেই আমি নিরুপায়।" কুমার বলিলেন, তিনি স্বীকার করিতেছেন যে, পলাইবেন না। যাহা হউক, এই যাত্রা পরে স্থগিদ হইল।

আর একবার কুমার জেদ্ ধরিলেন, একাকী তিনি অযোধ্যা যাইবেন। মহারাণী অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া আমাদিগকে বলিলেন, গেলে যে উহাকে ফিরিয়া পাইব, সে আশা নাই। শরীর শোধরাইবার জন্য মুঙ্গের, বৈদ্যনাথ প্রভৃতি স্থানে গেলে ত হয়। অথবা পদ্মার ধারে যে সব স্বাস্থ্যকর স্থান আছে, সেখানে বেড়াইলেও চলিত! * * যাহারা কুমারের সহগামী হইবে, তাহাদের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন, তারা ত সর্ব্বনাশ করিবে। পরে কহিলেন, তিনি বলিয়াছেন, রাজবাটীতে তিনি থাকিতে পারিবেন না। যাহা হউক, ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা এ যাত্রায় প্রতিবন্ধক হইলেন। পরদিন প্রাতঃকালে মহারাণী-

মাতাকে দর্শন করিতে গেলাম। অনেকে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কুমারের অযোধ্যাগমনের প্রস্তাব লইয়া বড় গোল উঠিয়াছে। যাহারা ইহাতে তাঁহাকে প্রবৃত্ত করাইয়াছে, তাহাদের উপর মাতার বিরক্তির সীমা নাই। কুমার নিবৃত্ত হইতে চান না, কিন্তু কোন কোন ব্রাহ্মণপণ্ডিত বলিয়াছেন যে, ছয়মাস মধ্যে তাঁহার কয়টা রিষ্টি আছে। কাজেই তাহার নাশার্থ কিছু না করিলে নহে। কেহ কেহ সন্দেহ করিতেছিলেন, উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া পণ্ডিতমহাশয়েরা একহাত লাভের পন্থা দেখিতেছেন, কিন্তু মহারাণী অবশ্য তাহা বুঝিতেছিলেন না। রিষ্টিনাশোপলক্ষে যাহা-কিছু করণীয়, সকলেরই অনুষ্ঠান করিবার আদেশ হইয়া গেল। গণকগণ বলিয়াছিল যে, প্রাণসংশয় হইবে, কিন্তু সে কথা তাঁহার নিকট গোপন করা হইতেছে, মার বিশ্বাস ইহাই। তাঁহার চক্ষু জলে ভাসিতেছিল।

আবার পরদিন প্রাতে রাজান্তঃপুরে গিয়া দেখি, অবস্থা পূর্ব্ববৎ। একাদশীর উপবাস ও কুমারের

রিষ্টিসংক্রান্ত চিন্তায় মাতার মূর্ত্তি শীর্ণ ও মলিন দেখাইতেছিল। স্থির হইয়াছিল, রিষ্টিনাশার্থ দুই-প্রকারের যাগ হইবে, বৈষ্ণব ও তান্ত্রিক। তান্ত্রিক-মতে তাঁহার যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল না, কিন্তু ব্রাহ্মণগণের ব্যবস্থায় দুইয়েরই অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

এ সকলে কিন্তু কুমারের যাত্রা স্থগিদ হওয়ার কোন সম্ভাবনা দেখা গেল না। মা বলিতেছিলেন, আমার অনুরোধ শুনিবে কেন? আমরা ত কেহ নহি। অন্য বিষয় দূরের কথা, বিবাহে পর্য্যন্ত নয়। এই কথাকয়টিতে আমি মহারাণী-মাতার আন্তরিক বেদনা অনুভব করিলাম। কুমার তাঁহার মতে বিবাহ করেন নাই, ইহা লইয়া বাহিরের লোককে আলোচনা করিতে শুনিতাম, কিন্তু মার মুখে ইতিপূর্ব্বে সে কথা আর কখন ব্যক্ত হয় নাই। আমি বলিলাম, "মা যদি বুঝিতেছেন যে, যাওয়ার ফল বিশেষ অনিষ্টকর হইবে, তবে আপনিই কেন জেদ্ করুন না? জেদ্ না করিলে চলিবে কেন?" মা উত্তর করিলেন, "কি করিব? কোকন কাল

আমায় বলিয়াছিল, যদি আমি না যাইতে দিবার জন্য জেদ্ করি, তবে লুকাইয়া যাইবে।" পরে অতি মৃদুভাবে আবার বলিলেন যে, গোপনে তিনি জানিতে পারিয়াছেন, উইল পর্য্যন্ত না কি হইতেছে। খস্ড়া হইয়া রামপুর গিয়াছে, ইহা তিনি শুনিয়াছেন। * * কে জিজ্ঞাসা করিলে বলে, সে সব কথায় এখন তাঁর দরকার কি? পুনশ্চ মা বলিলেন, "দেখ বাপু, উহাকে শিশুকাল হইতে পালন করিলাম। এতদিন উহার জন্য বিষয়ভার বহন করিলাম। কোষ্ঠীতে যেমন দেখা যাইতেছে, বেশীদিন আর বাঁচে বোধ হয় না। আমি কি করিব? মানুষ কাহারো না কাহারো আশায় বিষয়-আশয় করে। যদি কিছু হয়, আমি এই বিষয়ের মধ্যে কদাপি থাকিব না।" মার চক্ষু জলে পূর্ণ হইল।

ইহা এখানে বলা আবশ্যক যে, কুসংসর্গের মোহে পড়িয়া কুমার অনেকসময় মহারাণীমাতাকে কষ্ট দিতেন বটে, কিন্তু তিনি বাস্তবিক তাঁহাকে আন্তরিক ভক্তি করিতেন। নানাকার্য্যে ও ব্যবহারে

ইহা বুঝা যাইত। এরূপ মাতার স্নেহক্রোড়ে আশৈশব লালিত-পালিত হইয়াও তিনি মানুষ হইতে পারেন নাই, ইহা অবশ্য অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। কিন্তু মাতৃচরিত্রের স্নিগ্ধজ্যোতিঃপ্রভাবে তাঁহাতেও মধ্যে মধ্যে মহত্ত্বের উন্মেষ দেখা দিত।

১৩

সেকালে পুটিয়ায় বৈশাখজ্যৈষ্ঠমাসে "পদ্মযাত্রা"র বড় ধুম ছিল। রাজপরিবারের কুলদেবতা গোবিন্দজী-বিগ্রহ পর্য্যায়ক্রমে মাসের নির্দ্দিষ্ট দিনে এক সরিকের ঠাকুরবাড়ী হইতে অন্যের দেবালয়ে কিরূপ সমারোহে গৃহীত হইতেন, সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। বৎসরের প্রারম্ভে প্রত্যেক রাজবাটিতে তাঁহার অধিষ্ঠান হইলে একএকদিন গোবিন্দজীর পুষ্পোৎসব হইত। সে দিন অপরাহ্ণে রাশিরাশি সদ্যোবিকসিত শ্বেত এবং রক্তোৎপলে তিনি বিভূষিত হইতেন। দেবমন্দিরের সর্ব্বত্র বিকচ-কমলের সজ্জা ও সৌরভ এবং সন্ধ্যার প্রাক্কালে

সে শোভা বিবিধ আলোকমালায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত।

রাজবাটীতে তখন বারমাসে আঠার পার্ব্বণ এবং সকল কাজের প্রধান অঙ্গ ব্রাহ্মণঠাকুরদের ভোজন-ব্যাপার। এই পুষ্পোৎসব-উপলক্ষেও তাহার কোন ত্রুটি হইত না। মহারাণী সাময়িক নানাবিধ সুমিষ্ট ফলমূল সংগ্রহ করাইয়া এই সময়ে ব্রাহ্মণদের মত সকলশ্রেণীর অতিথি-অভ্যাগতগণকে পরমযত্নে আহার করাইতেন। অন্যান্য সরিকের গৃহেও এই পর্ব্বোপলক্ষে যথেষ্ট ধুমধাম হইত। ফলত নূতন বৎসরের প্রথম দুইমাস এইরূপ ক্রমাগত ধর্ম্মসঙ্গত বসন্তোৎসব আর কোথাও আচরিত হইত কি না, জানি না।

মহারাণীমাতার পিত্রালয়েও গৃহদেবতার এই পুষ্পসজ্জার মহোৎসব বরাবর অনুষ্ঠিত হইয়া আসিয়াছে। তদুপলক্ষে নিমন্ত্রিতদের সভায় রাজবাটীতে তাম্রকূটসেবন যেরূপ নিষিদ্ধ ছিল, এখানেও সেইরূপ। প্রায় ত্রিশবৎসর পূর্ব্বের

কথা বলিতেছি। একবার এই সময়ে "স্বর্ণলতা"র প্রণেতা ডাক্তার তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সরকারীকার্য্যোপলক্ষে পুটিয়ায় উপস্থিত ছিলেন। "বাবুর বাড়ীতে" (মহারাণীর পিতৃগৃহে) পদ্মযাত্রার দিন তাঁহার ও আর কয়জন গবর্ণমেণ্টকর্ম্মচারী এবং স্কুলমাষ্টারদের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। স্থানীয় বিস্তর ভদ্রলোক সমবেত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের ন্যায় ইংরেজিনবীশ কয়টিরও আদর-অভ্যর্থনার কোন ত্রুটি হয় নাই। কিন্তু প্রথাবিরুদ্ধ বলিয়া "তামাক দিবার" কোন ব্যবস্থা ছিল না। এখানে বলিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, দেবাদির অর্চ্চনাস্থলে তামাকের চলন নিতান্ত আধুনিক প্রথা, পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের মুখে শোনা যায় যে, নবদ্বীপাধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় পুত্র শিবচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, যে সকল ব্রাহ্মণ তামাকসেবা করেন, তাঁহাদিগকেও প্রণাম করিও। সে যাহা হউক, নিমন্ত্রিত শিক্ষিতবাবুকয়টির কাছে ইহা বড় বিসদৃশ বোধ হইতেছিল এবং "তামাক

তামাক” করিয়া তাঁহারা অধীর হইয়া উঠিতে ছিলেন। তাঁহাদের তত্ত্বাবধানের জন্য যে (আমলা) ভদ্রলোকটি নিযুক্ত ছিলেন, তিনি গলবস্ত্র হইয়া বিনীতভাবে জানাইলেন যে, সে ক্ষেত্রে তামাক-সেবন নিষিদ্ধ। গঙ্গোপাধ্যায়মহাশয় ইহাতে অপমান-জ্ঞান করিয়া তৎক্ষণাৎ সভাস্থল ত্যাগ করিয়া গেলেন। তিনি যে আহূত যুবকদলের অগ্রগণ্য হইয়া আসিয়াছিলেন, তাহার ভিতর কেহ কেহ প্রথমে ব্যবহারটা অনুমোদনীয় নহে ভাবিয়া ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে দলপতিকে অনুসরণ করিতে বাধ্য হইলেন। পুটিয়ার ভদ্রসমাজ ইংরেজী-ওয়ালাদের এই আচরণ অবশ্য প্রশংসমান-চক্ষে দেখেন নাই এবং ক্রমে ইহা মহারাণীমাতার গোচর হইয়াছিল। কিন্তু তিনি ইহাতে কোন বিরাগপ্রকাশ করেন নাই। বরং ঘটনার ৩।৪ দিন পরেই তিনি তারকবাবুপ্রমুখ এই দলটিকে রাজ-বাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়া পরমসমাদরে প্রচুর আহার করাইয়াছিলেন। সেদিন অবশ্য সুবাসিত-পরম-

সেব্য-তাম্রকূট-সেবা বাদ যায় নাই। মহারাণী এইরূপ কমনীয় শিষ্টাচারে সর্ব্ববিধ অসৌজন্য পরাজিত এবং অমানীকে মান্যদান করিয়া লোক শিক্ষা দিতেন।

পুটিয়াস্থ যে নিরপেক্ষ কর্ত্তব্যপরায়ণ পুলিস্‌কর্ম্মচারীটির কথা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, তিনি এই নিমন্ত্রিতদলের একজন। এখনও তিনি জীবিত এবং ভগবানের কৃপায় দীর্ঘকাল পেন্‌শন্ ভোগ করিতেছেন।* সেদিনও গল্পটি তাঁহার মুখে নূতন করিয়া শুনিয়াছি। তিনি বলেন, একবার অন্নপূর্ণাপূজার দিন ওয়ারেণ্টের আসামী মহারাণীর দেবসেবার নায়েবকে শিবের বড়মন্দির হইতে গ্রেপ্তার করিয়া আনিলাম। আর কেহ হইলে আমায় কখন ক্ষমা করিতেন না, কিন্তু মহারাণীমাতার ইহাতে কিছুমাত্র ক্রোধের সঞ্চার হয় নাই। আর একবার রাজবাটীর বরকন্দাজেরা একজন প্রজাকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছিল। সংবাদ পাইয়া তাহাদিগকে যথারিহিত চালান দিলাম। তাহাতেও

* এক্ষণে স্বর্গীয়।

মহারাণীর কোন ভাবান্তর হয় নাই। ন্যায়পরতার দিকে তাঁর এম্‌নি তীক্ষ্ণদৃষ্টি ছিল।

মহারাণীমাতার পুত্রবৎ স্নেহভাজন এক তরুণ যুবকের বালিকা পত্নী বিবাহের কিছুদিন পরে এক দুঃসাধ্য পীড়ায় কষ্ট পাইতেছিলেন। বন্ধুরা অনেকেই উপদেশ দিলেন, সবে বিবাহ হইয়াছে,—তোমার অত মাথাব্যথা কেন? আর একটা বিবাহ কর। কিন্তু যুবকটি মহা অর্থকৃচ্ছ্র সহ্য করিয়াও স্ত্রীর সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন। মাতা সর্ব্বদা এই দম্পতির সংবাদ লইতেন এবং যুবার বন্ধুবান্ধবদের বাচনিক সহধর্ম্মিণীর অসুখের সময় তাহার বিষম পরীক্ষার কথা শুনিয়াছিলেন। প্রায় একবৎসর পরে সাক্ষাৎ হইলে তিনি তাহাকে কাছে বসাইয়া অশ্রুমোচন করিতে করিতে বলিলেন, "ছেলেমানুষ তুমি যে ধর্ম্মবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছ, তাহাতে আমি বড় সন্তুষ্ট হইয়াছি। ভগবান্ অবশ্য তোমার ভাল করিবেন।"

মহারাণীমাতার অসাধারণ চক্ষুলজ্জা ছিল;

তাহার দুইএকটি পরিচয় ইতিপূর্ব্বে দিয়াছি। ১২৮৯ সালের আশ্বিনমাসে যে প্রকাণ্ড ধূমকেতুর উদয় হইয়াছিল, একদিন শেষরাত্রে মহারাণী তাহা দর্শন করিয়া প্রাতে আমাদের কাছে তাহার গল্প করিতেছিলেন। কয়দিন পূর্ব্বে ইহা দেখিয়া আমি মাতাকে বলিয়াছিলাম। তাই আমায় লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"আজ তোমার ধূমকেতু সুন্দররূপে দেখিয়াছি ; খুব বড়।" অন্যান্য কথাবার্ত্তা চলিতেছে, এমন সময়ে এক প্রৌঢ়া ব্রাহ্মণকন্যা একবাটী তৈল আনিয়া মহারাণীর কাছে বসিলেন এবং আমাদের সমক্ষে চুল খুলিয়া বেশ সপ্রতিভভাবে তাহাতে মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। কেহ বলিল, এখনও হাজিরা দিবার লোক বাকী আছে,—ঠাকুরাণীটি তথাপি নির্ব্বিকারভাবে তাঁহার কুন্তলদাম তৈলনিষিক্ত করিয়া চলিলেন। দুইচারিফোঁটা তৈল হর্ম্ম্যতলে পড়িতেছিল এবং তিনি মাঝে মাঝে হাতমুখ নাড়িয়া গল্পও করিতেছিলেন। মহারাণীমাতা তৈল স্পর্শ করিতেন না, দৃশ্যটাও তাঁর ভাল লাগিতেছিল না,

ইহা আমি বুঝিতে পারিতেছিলাম। কিন্তু তিনি গম্ভীর হইয়া সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিলেন। ঠাকুরাণীটির ব্যবহার আমার সহিষ্ণুতা অতিক্রম করিল। আমি হাসিয়া বলিলাম, "রাজার সম্মুখে তেল মাখিতে নাই।" ব্রাহ্মণী তাচ্ছীল্যের হাসি হাসিলেন, "শ্রীশকে সেদিন ছোট্ট দেখিলাম, এখন বড় হয়েছে! তা আমি রাণী কৃষ্ণমতীর সঙ্গে একত্রে খাইতাম।" আমি—"খাইতে আছে, তেল মাখিতে নাই।" মা হাসিলেন, আমিও হাসিয়া উঠিলাম। ঠাকুরাণী ইহার পর উঠিয়া গেলেন। মহারাণী এতক্ষণ কিছু বলেন নাই, আস্তে আস্তে ত্রৈলোক্যকে বলিলেন, "তেলটুকু মুছিয়া লও।"

একদিন মহারাণী ও তাঁহার মাতার কাছে আমরা বসিয়া আছি, এমন সময় একটি অল্পবয়স্ক রাজকর্ম্মচারী আসিলেন। বিশেষ প্রয়োজনে অন্যের অসাক্ষাতে মাতার কাছে তাঁহার কিছু বক্তব্য ছিল। আমি উঠিতে চাহিলে মহারাণী এবং তাঁহার মাতা বলিলেন,—"তুমি উঠিলে কি হইবে? অনেকে

আছেন।” মহারাণী নিজে উঠিয়া জানালার দিকে গেলেন। তাঁহাদের কথা প্রায় শেষ হইয়া আসিল, এমন সময় কাদোর কোলে শ্রীসুন্দরী দেবীর ছোট কন্যাটি ঘুমাইয়া পড়িল। কাদো হাসিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিল—“আপনি বিছানা করিয়া দেন।” মা হাসিয়া, বলিলেন, “সে কি কথা?” আমি হাসিয়া বলিলাম, “বেশ তো, তাতে দোষ কি?” আমি বিছানার কাছে যাইতে না যাইতে মহারাণীমাতা নিজে বিছানা ছড়াইয়া দিলেন।

পূজার পূর্ব্বে একদিন প্রাতে তাঁহাকে প্রণাম করিতে গেলাম। দেখিলাম, তাঁর বড় খেজালৎ। চারিদিক্ হইতে অনাথা, বিধবা, বালকবালিকারা আসিয়াছে। কেহ পরবী, কেহ দান, কেহ কাপড় চাহিতেছে। মা বারংবার কাছারীতে ধনাধ্যক্ষের কাছে টাকা চাহিয়া পাঠাইতেছেন, হয় উত্তর পাইতেছেন না, নয় স্পষ্ট জবাব পাইতেছেন। বিরক্তির, খেজালতের সীমা নাই। এক ঠাকুরাণী বসিয়া আছেন, তাঁহার ডুলি প্রস্তুত, টাকা চাই,

এখনই যাইতে হইবে। মহারাণীমাতার অমন ধৈর্য্য, তাহাতেও আজ যেন কিছু চাঞ্চল্য দেখিলাম। এবং ইহা যে অসুস্থশরীর, বৈষয়িক নানা ঝঞ্ঝাট এবং কুমারের সেভাবে দেশভ্রমণে বহির্গত হওয়ার ফল, ইহাও বুঝিতে পারিলাম। কিছু পরে আমার দিকে ফিরিয়া তিনি বলিলেন—"আগে অনেক সহ্য করিতে পারিতাম, এখন কেন বা সহ্য হয় না, অল্পেই রাগ হয়।"

১৪

রাজদরবারে একশ্রেণীর লোক দেখা যায়, যাহা-দিগকে সাধারণ বহুরূপীর সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। বহুরূপী যখন যার উপর ভর করিয়া শিকার করে, তখন তাহার সেইরূপ রং, কিন্তু আসল উদ্দেশ্য যে আহার্য্যান্বেষণ, তাহাতে তাহার কখন ভুলচুক্ হয় না। পুটিয়ার রাজসভায় সেই প্রকৃতির একটি লোক ছিলেন। সামান্য কাজে প্রবেশ করিয়া ক্রমশ তিনি পদস্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহা যে বিদ্যাবুদ্ধি অথবা কার্য্যকুশলতার বলে, এমন বলিতে পারি না। বহু-

রূপ এবং তির্য্যগ্‌গতিতে তিনি পারদর্শী ছিলেন এবং আজীবন তাহাই তাঁহার সাধনার বিষয় ছিল। জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ প্রকৃতির নিয়মানুসারে বলবানেরই হইয়া থাকে, কিন্তু মনুষ্যসমাজে সামর্থ্যের সংজ্ঞা কেবল শারীরিক এবং মানসিক শক্তিতেই আবদ্ধ নহে। যাঁহার কথা হইতেছে, সাদাসিধে চাল ও পরামর্শ কখন তিনি পছন্দ করিতেন না। মসলার প্রাচুর্য্য নহিলে অনেকের যেমন সুপক্ক ব্যঞ্জনও মুখ-রোচক হয় না, সব কাজে একটু চাণক্যনীতির ছিটে-ফোঁটা না থাকিলে ইনি তেম্‌নি তাহাতে যথেষ্ট গুরুত্ব অনুভব করিতে পারিতেন না। রাজকুমার যেদিন প্রথম পলায়ন করেন, তাহার পরদিন পুলিস-বিভাগের তখনকার কর্ত্তা বিখ্যাত মন্‌রো সাহেব পুটিয়ার থানা পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। সকল শুনিয়া তিনি মহারাণীকে আশ্বস্ত করেন এবং পুলিসের উপর কড়া হুকুম দিয়া যান, কুমারকে যেখানেই পাওয়া যাক্‌, আনিয়া দিতে হইবে। কুমারের গৃহে প্রত্যাগমনের পর পরামর্শ স্থির হইল,

মন্‌রো সাহেবকে বিপদের দিনে সহানুভূতি ও সহায়তার জন্য ধন্যবাদ দিয়া মহারাণীমাতার তরফ হইতে একখানি পত্র লেখা হউক্‌। এই চিঠির মুসাবিদার ভার আমাদের উপর পড়িল। উহাতে সাদাকথায় প্রকৃত ঘটনা বিবৃত করা হইয়াছিল, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মচারীমহাশয় বলিয়া বসিলেন যে, ঠিক্‌ কথা লিখিলে কুমারমহাশয়ের উপর দোষ পড়িবে। লেখা হউক যে, তিনি আপনা-আপনি ফিরিয়া আসিতেছিলেন, পথে রাজকর্ম্মচারীদের সঙ্গে দেখা হইয়াছিল ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, তাঁহার কথা টিকে নাই। মুখে ইনি সকলকেই পরিতুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করিতেন, কিন্তু বহুরূপীরা কখন বেশী দিন লোক-চক্ষুকে প্রতারিত করিতে পারে না। সাধারণ্যে তাঁহার নাম রটিয়াছিল—"মিছরির ছুরী।" সে যাহা হউক, তাঁহার চরিত্রের একটা দিকে কিঞ্চিৎ হাস্য-রসের অবসর ছিল। ফলের মধ্যে কাঁঠাল তাঁর অতিরিক্ত প্রিয় ছিল। একবার অজীর্ণরোগে চিকিৎসক তাহার ব্যবহার বিশেষরূপে নিষেধ

করায় তিনি প্রায় রোদনোন্মুখ হইয়া বলিয়াছিলেন —"তেমন করিয়া বেঁচে থাকার সুখ কি ?" আর একবার প্রভুচরিত্রজ্ঞ পুরাতন ভৃত্য জমাখরচ লেখাইতেছিল। অন্যান্য দ্রব্যের ফর্দ্দ দিয়া সে বলিয়া বসিল—"লিখুন, কাঁঠাল চারি-আনা !" মনিব কিছুতে মনে করিতে পারিতেছিলেন না যে, লিখিত তারিখে তিনি তদীয় প্রিয়ফলটির রসাস্বাদন করিয়াছিলেন। অতএব অবাক্ হইয়া প্রায় আধঘণ্টা ভাবিলেন। শেষে বলিলেন—"যা করেচু, তা করেচু ; এমন কাম আর করিস্ না !"

ইনি অনেকদিনের কর্ম্মচারী—মহারাণীর পিতার আমলের। কাজেই স্বার্থসিদ্ধির জন্য যতটা আড়ম্বর করিয়া জাল পাতিবার দরকার মনে করিতেন, তাহার চেয়ে অনেক কম আয়াসে কাজ হাসিল হইত। মহারাণী ইহাকে বেশ চিনিতেন, কিন্তু চক্ষুলজ্জায় কিছু বলিতে পারিতেন না। তবে তিনি কখন অনুমান করিতে পারেন নাই যে, এই লোকটা নিজের উন্নতিলাভের আশায় তাঁহার ব্যক্তি-

গত-অনিষ্টচেষ্টাতেও পশ্চাৎপদ হইবে না। সাবালক হইবার পূর্ব্বেই কুমারের বৈষয়িকব্যাপারে হস্তার্পণ করার কথা বলিয়াছি। এই কর্ম্মচারীটি তখন হইতেই তাঁহার খাস্‌দরবারে যাতায়াত করিতে সুরু করেন। শেষে কুমারকে মাতার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া সর্ব্ব-প্রধান কর্ম্মচারী হইবেন, এ দুরাশাও তাঁহার হইয়াছিল। রাজকুমার এই ধৃষ্টতা সহ্য করিতে পারিলেন না। একদিন মহারাণীমাতাকে সব কথা বলিয়া দিলেন। সংসারে এতটা বিশ্বাস-ঘাতকতা থাকিতে পারে, মহারাণী ইহা জানিতেন না, অতএব বলিলেন, "না কোকন, তোমার ভুল হইয়াছে,—ইহা কি সম্ভব?" কুমার তাঁহার প্রত্যেক কথা প্রমাণ করিয়া দিবার অঙ্গীকার করিয়া মাতার নিকট প্রস্তাব করিলেন, গুপ্তভাবে থাকিয়া একদিন তাঁহাকে তাঁহাদের দুজনের বিশ্রম্ভালাপ শুনিতে হইবে। মহারাণী প্রথমে ইহাতে সম্মত হন নাই, কিন্তু শেষে পুত্রের অনুরোধ ও মাথার দিব্য উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। নির্দ্দিষ্ট দিনে কুমার বহির্ব্বাটীর

মন্ত্রণাগৃহে কর্ম্মচারীটিকে ডাকাইয়া নিভৃতে তাঁহার সঙ্গে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন—মাতাকে অন্তরালে থাকিয়া সকলই শুনিতে হইল! কিন্তু তিনি সেই অকৃতজ্ঞ বয়োবৃদ্ধটিকে কোন অনুযোগ করিলেন না, বরং পাছে সে মাতাপুত্রের সেই ষড়যন্ত্রের কথা জানিতে পারে, ইহা ভাবিয়া লজ্জিত হইয়াছিলেন। কথাটা পরে প্রকাশ হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু কর্ম্মচারীমহাশয় ইহা গায়ে মাখেন নাই। বরং কুমারবাহাদুর শেষে স্পষ্টভাবে তাঁহার দুরাশায় বাদ সাধিলে ইনি তাঁহাকে ভয় দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, "আপনি জানেন যে, আমি ইচ্ছা করিলে আপনাকে পথের ভিখারী করিতে পারি। আপনি দত্তক, তাহা আমি অসিদ্ধ করিতে পারি।" ম—মহাশয়ের এই সাহস মুমূর্ষুর শেষ-উদ্যমতুল্য,—কেননা, এক হস্ত কণ্ঠ-দেশে, অন্য হস্ত পদতলে, ঘোর স্বার্থান্ধ বৈষয়িকের এই জীবন্তচিত্র তাঁহার জীবনের আদর্শ ছিল। কুমার উত্তরে কেবলমাত্র বলিয়াছিলেন,—"আমায় অসিদ্ধ করিয়া আপনি কি দত্তক হইবেন?"

শ্যামসাগর নামে বৃহৎ দীর্ঘিকার তিন দিকে—পূর্ব্ব, পশ্চিম এবং উত্তর—পুটিয়ার রাজাদের সৌধশ্রেণী। যতদিন লস্করপুরের জমিদারী পুটিয়ার ঠাকুরদের করায়ত্ত, প্রাচীন পরিখা ও এই সরোবর বোধ করি ততদিনের। তাহা না হইলেও শ্যামসাগর যে সুদীর্ঘকাল কোনরূপ সংস্কারের মুখ দেখে নাই, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার হরিতাভ সলিলরাশি মনুষ্যের অব্যবহার্য্য—এবং স্থানীয় অস্বাস্থ্যকরতার একটা প্রধান কারণ। কয়টি রাজবাটীর মধ্যস্থলে এরূপ একটা জলাশয় অবাধে দীর্ঘকাল ধরিয়া ম্যালেরিয়ার বিষ উগদার করিতেছে, অথচ কখন তাহার প্রতিবিধান হয় না। ইহার একমাত্র অর্থ এই যে, শ্যামসাগর সাজার সম্পত্তি এবং সকল সরিকের হস্তীদের জলকেলির স্থান।

মহারাণীর স্বামী রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ একবার এই দীর্ঘিকাটিকে ব্যবহারে লাগাইয়াছিলেন। নীল-বিদ্রোহের সময় তিনি রাজশাহীতে একজন প্রধান

নেতা ছিলেন, সে কথা প্রথমেই বলিয়াছি। নীল-কুঠীসকল লুট করাইয়া বিস্তর নীল তিনি ইহাতে ডুবাইয়া দেন। সম্ভবত সেই অবধি ইহার জল এরূপ অস্বাস্থ্যকর হইয়াছে।

দ্বিতীয়বার আমি যখন পুটিয়ায় যাই, চারি-আনির রাজবাটীর সীমানায়, শ্যামসাগরের অদূরে আমাদের বাসা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। সকল সরিকের হাতীগুলি মধ্যাহ্নের পর স্নানার্থ ক্রমে ক্রমে সেখানে নীত হইত, এবং পরে মাহুতদের শাসন-মুক্ত হইয়া স্বচ্ছন্দে জলক্রীড়া করিতেছে, দেখিতে সেই বাল্যকালে আমার ভারি ভাল লাগিত। পাঁচ-আনির (মহারাণীমাতার তরফের) দুইটিমাত্র হাতী ছিল—তাহার ভিতর দন্তীটি সুঠাম বিপুলকায়, রজতশুভ্র অসাধারণ দীর্ঘ দন্তযুগল এবং জীবহিংসা-প্রবণতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। চারি-আনির রাজা পরেশনারায়ণের তখন সাত-আটটি হস্তী ছিল—কিন্তু তাহার কোনটিই উহার তুল্য নহে। রাজা অত্যন্ত হস্তীপ্রিয় ছিলেন, কিছুদিনের ভিতর বিশ-

হাজার টাকায় দুইটি প্রকাণ্ড দন্তী ময়মনসিংহের সুসঙ্ দুর্গাপুর হইতে আনাইয়া লইলেন। যেদিন তাহারা আসিয়া পৌঁছিল, সেদিন স্বয়ং কয়ক্রোশ প্রত্যুদ্গমন করিয়া রাজা তাহাদের লইয়া আসিলেন। তাঁহার আনন্দের সীমা ছিল না। ফলত সেরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর উন্নতদেহ সর্ব্বাংশে প্রায় তুল্য-যুগ্ম করীর সম্মিলন কদাচিৎ ঘটে। হস্তিপকদের কৌশলে পথ চলিবার সময় উভয়ে এরূপ মহিমাময় নির্ব্বিকারভাবে মস্তকোত্তোলন করিয়া মন্দগতিতে অগ্রসর হইত যে, দর্শকবৃন্দ তাহাতে মুগ্ধ হইত। পাঁচ-আনির কুঞ্জরটির পসার ইহাতে ক্ষুণ্ণ হইল। স্বয়ং করিবর সেটা অনুভব করিয়াছিলেন কি না, বলিতে পারি না, কিন্তু দুই সরিকের নিম্নশ্রেণীর আশ্রিতবর্গ এই ব্যাপার লইয়া একটা কলহ বাধাইয়া বসিল।

একদিন দুইপ্রহরে কাছারী বরখাস্ত করিয়া রাজবাটীর কর্ম্মচারীরা বাসায় গেলে পর শ্যাম-সাগরের জলরাশিতে একটা তুমুল কোলাহল উত্থিত

হইল। দেখিতে দেখিতে কৌতূহলী দর্শকবৃন্দে দীঘির ধার পূর্ণ হইল। আমি কিছু পূর্ব্ব হইতে দেখিতেছিলাম, পাঁচ-আনির ঐরাবতটি জলে একাকী পড়িয়া আপন মনে অবগাহনসুখ সম্ভোগ করিতেছেন। একটু পরে চারি-আনির নূতন দুই গজরাজ মাহুতবাহিত হইয়া তাহার ঠিক্ সম্মুখে স্নানে নামিলেন। দেখিতে দেখিতে পাঁচ-আনির মাহুতদের সঙ্গে নবাগত মাহুতদুটার কণ্ঠপরীক্ষা হইয়া গেল এবং তখন হাতীতে হাতীতে যুদ্ধ বাধিল। খানিকক্ষণ যোঝাযুঝির পর পাঁচ-আনির হাতীর হার হইল এবং সে শুণ্ড ও পুচ্ছ উচ্চ করিয়া জলাশয় ছাড়িয়া দ্রুতপদে পলায়ন করিল। এই অসম দ্বন্দ্বের জন্য সে আদৌ প্রস্তুত ছিল না।—জলে পড়িয়া একাকী তীরে অর্দ্ধদণ্ডায়মান দুইটা মহাবলশালী প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখীন হওয়া সম্ভবও নহে। প্রধান কর্ম্মচারীদের আদেশের অপেক্ষা না করিয়াই দুই সরিকের সড়কীওয়ালারা তখন সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইল। হৈহৈ ব্যাপার,—খুনোখুনি অনিবার্য্য হইয়া

উঠিয়াছে, এমন সময়ে চারি-আনির দেওয়ানজী কোনরূপে আহ্নিক শেষ করিয়া তাঁহার অদূরবর্ত্তী বাসা হইতে ঘটনাস্থলে দেখা দিলেন। লাঠা-লাঠি-মারামারি আর হইতে পাইল না।

ভৃত্যদের বিবাদ এইরূপ অল্পে-স্বল্পে মিটিয়া গেল, কিন্তু হস্তীদের জয়পরাজয় দুই সরিকের প্রভুরা আপনার বলিয়া গ্রহণ করিলেন। সে মনোমালিন্য কতদিন ছিল, ঠিক্ বলিতে পারি না। কিন্তু এই উপলক্ষ্যে স্বয়ং মহারাণীমাতা যেরূপ ক্ষুণ্ন হইয়াছিলেন, তাহা আমার মনে পড়িতেছে। আশ্রিত মূকজন্তুটাকে অকস্মাৎ সেভাবে আক্রমণ ও পীড়িত করিয়া তাঁহাকেই অবমানিত করা হইয়াছে, তাঁহাকে এরূপ অভিমান ২।৩দিন প্রকাশ করিতে শুনিয়াছিলাম। মাতার বয়ঃক্রম তখন বাইশ-তেইশ-বর্ষ মাত্র।

ফলত তিনি সম্ভ্রান্ত ও ধনী পরিবারের একমাত্র সন্তান বলিয়া পিতামহী ও পিতার আদরে বাল্যকালে যেরূপ অভিমানিনী ছিলেন, সহজেই তাহা অনুমেয়।

তাঁহার বয়ঃক্রম যখন দ্বাদশবর্ষ, কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীসুন্দরী দেবী তখন জন্মগ্রহণ করেন। সেই অভিমানভাব মা'র পরিণতবয়সেও কখন-কখন প্রকাশ পাইত, কিন্তু সহজে নহে। তাঁহার কাশীবাসের কিছুদিন পূর্ব্বে কন্যাস্থানীয়া কোন আত্মীয়ার শরীর সর্ব্বদা অসুস্থ হইত। কিন্তু ঔষধাদিসেবনে ও নিয়ম-পালনে তাঁহার রুচি ছিল না, জেদ করিলে হিতে বিপরীত হইত। একদিন মহারাণী কাহাকেও বলিতেছিলেন, তাহাকে ঔষধ খাওয়াও, কিন্তু রাগ করিলে যেন খাওয়ান না হয়। ইহাতে নিকটে উপবিষ্টা এক ঠাকুরাণী হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন, "রাগ কেন?" মা দুঃখিত হইলেন, তাঁহার প্রফুল্ল-চক্ষু ছলছল হইল। একটু কম্পিতস্বরে বলিলেন, "এখন সকলেরই রাগের ভয় করিয়া চলিতে হয়। কত ভয়ে যে ভাত খাই, তার আর কি বলিব? যখন ভয় করিতাম না, তখন কাহাকেও না। এখন সবাইকে ভয় করিয়া চলিতে হয়।" সাবালক হওয়ার পূর্ব্বে কুমার মহারাণীর অজ্ঞাতসারে এক উইল করিয়া-

ছিলেন। কিছুদিন পরে তাহার কতক-কতক মর্ম্ম মাতার গোচর হইল। তিনি ইহাতে মহা বিরক্ত হইলেন। সহায়কারীদের ভিতর কেহ বলিয়াছিলেন, শুনিতে পাই, জনরব উঠিয়াছে যে, মহারাণী পিতার বিষয়ের উপর হস্তক্ষেপ করিতেও আমাদের ইচ্ছা আছে। তাহা কি হইতে পারে ? আর সে বিষয়ই বা কি ? মা শুনিয়া বিরক্তির সহিত অথচ তাচ্ছিল্য-ভাবে সে লোকটিকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "তবু যে বিষয় আছে, তাহার মত দশটা সংসার তাহাতে প্রতিপালিত হইতে পারে !"

কতকগুলি স্বার্থপর কুটুম্ব, আত্মীয় এবং আশ্রিত লোকের ব্যবহারে ইদানীং মধ্যে মধ্যে তিনি বড় মর্ম্মপীড়া পাইতেন, তাহার আভাস ইতিপূর্ব্বে দিয়াছি। তাঁহার জীবনের চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা,—সংসারত্যাগ করিয়া ৺কাশীধামে নির্জ্জনে বাস, এই-জন্য কুমারের বয়ঃপ্রাপ্তির পূর্ব্বেই পূর্ণ করিতে তিনি স্থিরসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। এই সময়ে একদিন কথা হইতেছিল যে, কুমারের ইচ্ছা, ছোটবাড়ী ও বড়-

বাড়ীতে এক করিয়া কতকগুলি ঘর বাড়ান। মা বলিলেন—"তা সত্য; নহিলে ঘরে কুলায় না।"— দেবী কাছে বসিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, "ঘরের অভাবে মহারাণীর নিজের বড় কষ্ট হয়। বর্ষার রাত্রে জলের সময় সরবৎ একটু খাইতে হইলেও এদিক্ দিয়া ওদিক্ দিয়া ঘুরিয়া তবে নীচে যাইতে হয়। এত-বড় লোকটার ওরূপ দশা দেখিয়া আমার বড় দুঃখ হয়।" মহারাণী বিষাদের হাসি হাসিলেন। পরে বলিলেন, "ঘরে আর কাজ নাই, এ বাড়ী ছাড়িতে পারিলেই আমি বাঁচি!" কাশী-বাসকালে নূতন বাড়ী খরিদ হইলে স্বহস্তে তিনি কয়টি ঘর পরিমার্জ্জিত করিতে করিতে উৎফুল্ল হইয়া বলিয়াছিলেন—"এতদিনে আমার নিজের বাড়ী হইয়াছে।"

১৬

বাঙ্‌লায় "পরিবর্ত্তনযুগ" বলিলে সচরাচর রাজা রামমোহন রায় ও তাঁহার পরবর্ত্তী পঞ্চাশবৎসরের মোটামুটি ইতিহাস বুঝায়। যে মানসিক, নৈতিক

ও সামাজিক বিপ্লব এই যুগের প্রধান বিশেষত্ব, তাহার বীজ বস্তুত রাজার জীবদ্দশায় উপ্ত হইয়াছিল মাত্র। স্বর্গীয় রামতনু লাহিড়ী মহাশয় একটি গল্প করিতেন, তাহার আলোচনায় এই কথা পরিস্ফুট হইয়া উঠে। খ্যাতনামা অধ্যাপক ডেরোজিও সাহেব একদিন হিন্দুকলেজের উচ্চশ্রেণীতে পড়াইতে গিয়া দেখেন, ছাত্রদের ভিতর ঘোর তর্কবিতর্ক চলিয়াছে, শিক্ষাসম্বন্ধে রাজা রামমোহন রায় যে আবেদনপত্র গভর্ণর-জেনারেলের নিকট পাঠাইয়াছেন, তাহার লেখক স্বয়ং রাজা কি না? সকল শুনিয়া ডেরোজিও বলিলেন, "তোমরা সব মানুষ, না অচেতন লোষ্ট্রখণ্ডমাত্র? দেশে শিক্ষাপ্রণালীর আমূল পরিবর্ত্তনের কথা উঠিয়াছে। কোথায় তাহার ভালমন্দ বিচার করিবে, না ব্যক্তিবিশেষের লিপিকুশলতার কথায় তন্ময় হইয়া আছ? রাজা রামমোহন ইংরেজীতে কেমন সুপণ্ডিত ও সুলেখক জানিলে এ সংশয় তোমাদের মনে উঠিত না।" ফলত পাশ্চাত্যশিক্ষাদীক্ষায় নববর্ষার বন্যাপ্রবাহবৎ

যে উদ্দাম চিন্তা এবং উচ্ছৃঙ্খল ভাবস্রোত বঙ্গে তখন হইতে দেখা দিয়াছিল, তাহার আবিলতা এখনও সম্পূর্ণ কাটে নাই। বঙ্গীয় যুবকদের সাধারণ রীতি এবং চরিত্র ইহার প্রমাণ।

বঙ্গকুলললনাদের সম্বন্ধে তেমন নিঃসংশয়ে কিছু বলা চলে না। তবে পশ্চাত্যসভ্যতার দুর্দ্দমনীয় প্রভাব যে অল্পবিস্তর তাঁহাদিগকেও চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে, ইহা অস্বীকার করার জো নাই। দেখিয়া শুনিয়া বর্ষীয়ান হিন্দুসমাজহিতৈষীরা প্রমাদ গণিতেছেন। তাঁহাদের ভিতর অনেককে বলিতে শুনিয়াছি, সেকালের ও একালের স্ত্রীচরিত্রের একটা সামঞ্জস্যবিধান করিতে পারিলে এই স্রোত ফিরিতে পারে। কিন্তু ইহা কি সম্ভব?

মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবীর জীবনে সেকালে ও একালের হিন্দুমহিলাচরিত্রের একটা সমন্বয়চেষ্টা দেখা যায়। ছত্রিশবৎসরমাত্র বয়সে তিনি স্বর্গা-রোহণ করিয়াছিলেন। ইহার ভিতর যে জীবন তিনি যাপন করিয়াছিলেন এবং যে সকল কার্য্য

তাঁহার দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাতেই এই সামঞ্জস্য সম্পূর্ণ সম্ভবপর বোধ হয়।

শ্রাবণমাসে একদিন বেলা ১১টার সময় রাজ-বাড়ীতে গেলাম। মহারাণীমাতাকে প্রণাম করিতে গিয়া দেখি, ছোট-তরফের পুরাতনবাটীর কোন স্থান হইতে একটি শালগ্রামশিলা পাওয়া গিয়াছে, তিনি তাহার পবিত্রীকরণ লইয়া ব্যস্ত। তাঁহার ঘরের বাহির "হলে" পুরোহিতমহাশয় পাঁজিপুঁথি লইয়া সেই সম্পর্কীয় ব্যবস্থা নির্ণয় করিতেছেন। মহারাণী অন্তরাল হইতে অন্যের দ্বারা তাঁহাকে অনেক প্রশ্ন করিলেন। শেষে স্থির হইল, শিলাটি ছোট-তরফের ঠাকুরবাড়ীতেই রাখা হইবে। মা বলিলেন, যখন ছোটবাড়ীতে পাওয়া গিয়াছে, তখন ইহা নিশ্চয় যে, উহা রাজসংসারের ঠাকুর, অন্যের নহে। প্রতি পদে তিনি আশঙ্কা করিতেছিলেন, পাছে ইহাতে কোন অধর্ম্ম স্পর্শে।

স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের প্রধানবিচার-পতিপদে উন্নীত হওয়ার খবর প্রচার হইলে বঙ্গের

সর্ব্বত্র সভাসমিতি হইয়াছিল। পুটিয়ায় সেজন্য আনন্দোৎসব হইল। উদ্যোগীরা তাঁহার অনুমতি লইতে গিয়া শুনিলেন, মাতা তদুপলক্ষে কতকগুলি ভদ্রলোককে একদিন রাজবাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন।

কোন আত্মীয়ের গৃহ হইতে একদিন প্রাতে প্রাচীনা এক পরিচারিকা তাঁহাকে দেখিতে আসিল। মা, কোন অল্পবয়স্কা আত্মীয়া কি করিতেছে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তর—"প্রাতে দেখিয়া আসিয়াছি, বই লইয়া বসিয়াছেন, বলিলাম—'কুকি বইয়ের জন্য কত হয়েচে, আবার!'" ইহাতে তাহার স্বামীর স্ত্রীশিক্ষার প্রতি বিরাগের কথা উঠিল। বালিকার পাঠের জন্য কি কি বই আনাইয়া দেওয়া যাইতে পারে, মাতা আমায় সুধাইলেন। আমি "মেজ বউ", "সুরুচির কুটীর" এবং "বঙ্গমহিলা"র নাম করিলাম। স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তাসম্বন্ধে তাঁহার ধারণা এরূপ বলবতী ছিল যে, কেহ তাহাতে সংশয়প্রকাশ করিলে তিনি বিস্মিত হইতেন।

পুটিয়ায় আমি একবার বালিকাবিদ্যালয়সংস্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলাম। স্থানীয় ভদ্রলোকদের সহায়তা-প্রাপ্তি দূরে থাকুক, অনেকেই তাহাতে খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন। কেবল মহারাণীমাতার উৎসাহ ও সহানুভূতির বলেই আমি তাহাতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম।

রাজবাটীতে বিস্তর ইংরাজী-বাঙ্‌লা সংবাদপত্র আসিত। আমি মহারাণীমাতার নিকট প্রস্তাব করিলাম, রাজবাড়ীর বাহিরে একটি ঘরে সেগুলি রক্ষিত হইলে সাধারণের পড়াশুনার সুবিধা হইতে পারে। মাতা ইহার অনুমোদন করিয়া কর্ম্মচারী ও দ্বারবান্ নিযুক্ত করিয়া দিলেন এবং সেই পাঠাগারে তাঁহার সমস্ত পুস্তক দান করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন।

মাঝে মাঝে তিনি কথাপ্রসঙ্গে আমাদিগকে ব্রাহ্মসমাজের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম কি, তাহার কয়টি সম্প্রদায়, কোন্ সম্প্রদায় কি কাজ করিতেছে? ধর্ম্ম এবং সমাজ-সংস্কারের সঙ্গে

সঙ্গে রাজনীতির আলোচনাও সাধারণ সমাজের লক্ষ্য শুনিয়া আগ্রহে তিনি অনেক প্রশ্ন করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, উপনিষদের প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবাদ স্বভাবতই তাঁহাকে বেশী আকৃষ্ট করিত।

একদিন প্রাতে মাতা সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিলেন, তাঁহার শিশু ভগিনীপুত্র কাছে বসিয়া দুষ্টামি করিতেছিল। তাহার চাপল্যে মা ঈষৎ বিরক্ত হইলেন। বলিলেন, "ছি কোকন!" আমি বলিলাম, "মা আপনি উহা নিবারণ করিতে পারিবেন না, আর ছেলে বেলায় একটু দুষ্টামি ভাল, বরং ঐ অবস্থাতেই মুখে মুখে সব শিখাইতে হয়। আমিও বোধ হয় ঐরূপ কতই আপনাকে বিরক্ত করিতাম।" মা হাসিলেন, "না তুমি বেশ শান্ত ছিলে।" প্রাচীনা ভগবতী দাসী মাকে ব্যজন করিতেছিল, বেশী কথা কহা তাহার স্বভাব নহে, মৃদুভাবে বলিল, "না, আপনি বড় সুবুদ্ধি ছিলেন, আমরা সকলে কোলে লইতাম।" এই দাসী মহারাণী ও তাঁহার ভগিনীকে মানুষ করিয়াছিল। সে বলিত, মা ছেলে বেলা হইতে

তাহার উপর কখন রাগ করেন নাই। কোকনের আমার প্রতি বালকসুলভ অসংখ্য প্রশ্ন শুনিয়া মা খবরের কাগজ পড়িতে পড়িতে ঈষৎ হাসিতেছিলেন। কথায় কথায় আমি জানাইলাম যে, পদচ্যুত গুইকুমারের মৃত্যু হইয়াছে। মা বলিলেন, "বাঁচিয়াছেন! আহা, কার কপালে কি হয়, বলা যায় না!" জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিসে পড়িলে?" আমি—"ইংলিশম্যানে।" মাতা—"সোমপ্রকাশে পড়িতেছিলাম যে, গুইকুমার সংশয়াপন্ন কাহিল।" তার পর আমার মুখে ঢাকায় আত্মশাসনের সভা উপলক্ষে বিশহাজার লোক সমবেত হওয়ার কথা শুনিয়া তিনি আশ্চর্য্য ও আনন্দিত হইলেন।

একদিন যাত্রাগানের কথা হইতেছিল। আমরা উহার কৃত্রিমতা লইয়া কঠোর সমালোচনা করিতেছিলাম। কেহ বা কালুয়া-ভুলুয়ার সংএর কথায় নিন্দা করিতেছিলেন। মা বলিলেন, "সে খারাপ, কিন্তু বাসুদেব আমাদের ভাল লাগিত, এখন তা নাই।"

আর একদিন একটা বিবাহের সম্বন্ধের কথা হইতেছিল। পাত্রীর পিতামহ, মহাকুলীন কিন্তু দরিদ্র ও গণ্ডমূর্খ পাত্র স্থির করিতেছিলেন, পিতা এবং অন্যান্য আত্মীয়দের তাহাতে অমত। সকল শুনিয়া মহারাণীমাতা শেষোক্তদের বলিলেন, "তোমাদের বুঝি ইচ্ছা যে, মেয়েটি যেখানে সুখে থাকে, সেইখানে বিবাহ দাও? সেই ত ভাল!"

তিনি যখন বিষয়ভার কুমারের হস্তে দিয়া কাশী-বাস করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তখন জেলার মাজিষ্ট্রেট কলেক্টর রডাক্সাহেব বর্ষার সময় জল-পথে পুটিয়ায় আসিলেন। ইংরাজীনবীশ রাজকর্ম্ম-চারীরা কেহ সদরে উপস্থিত ছিলেন না। তজ্জন্য মহারাণীমাতার তরফ হইতে সাহেবকে বোট্ হইতে সম্বর্দ্ধনা করিয়া আনার ভার আমার উপর পড়িল। মা আমার প্রতি বিশেষভাবে আজ্ঞা করিলেন, সাহেবের সঙ্গে দেখা হইলে আমি যেন তাঁহার নামে বলি যে, কুমার প্রায় প্রাপ্তবয়স্ক হইলেন। এ অবস্থায় তিনি যদি চেষ্টা করিয়া কুমারের হস্তে

ষ্টেট্ অর্পণ করাইয়া মহারাণীকে বিষয়ভার হইতে মুক্ত করেন, তবে তিনি বড় উপকার বোধ করেন। তাহা হইলে যেখানে ইচ্ছা গিয়া ধর্ম্মচর্চ্চা করিতে পারেন। বলিলেন, "তুমি বেশ গুছাইয়া সব বলিও, * * ফলত দেখিও, আমায় যদি মুক্ত করিতে পার।" তাঁহার নিকট আর একদিন শুনিয়াছিলাম, পূর্ব্বে গঙ্গাস্নানে গেলেও কালেক্টরসাহেবকে বাঙ্লায় আরজী লিখিয়া যাইতে হইত।

একবার দেশ হইতে ফিরিয়া গিয়া দেখি, মহারাণীমাতার বসিবার ঘরে আর্টস্কুলের নূতন কতকগুলি ছবি টাঙানো রহিয়াছে। মদনভস্মের মূর্ত্তিও ছিল। দেখিয়া মাতা বলিতেছিলেন, শিবকে যেন গুলিখোর করিয়া আঁকিয়াছে! আমি আমাদের অধ্যাপক পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠভ্রাতা ৺কালীকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের চিত্রিত অপূর্ব্ব হরসম্মোহনমূর্ত্তির কথা তুলিলাম। তেমন সুন্দর চিত্রপট দেশীয় শিল্পী কেহ লিখিতে পারেন, না দেখিলে বিশ্বাস করা যায় না। কুমার-

সম্ভবের তৃতীয়সর্গ যেন মূর্ত্তিমান্ হইয়া তাহার সমস্ত গৌরবে এবং সৌন্দর্য্যে সেই ক্ষুদ্র আলেখ্যটিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। শুনিয়া মহারাণী তাহার সম্বন্ধে ঔৎসুক্যের সহিত অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। এই চিত্রপট আমি কবিরত্নমহাশয়ের কলিকাতাস্থ বাসস্থান তদানীন্তন ২৫নম্বর বেনিয়াটোলার গৃহে দেখিতাম। পূজনীয় আচার্য্যকে যতবার প্রণাম করিতে যাইতাম, অনিমেষনেত্রে দুইদণ্ডকাল সে ছবি না দেখিলে আমার তৃপ্তি হইত না।

১৭

মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবীর চরিত্রে যে সকল দেবোপম গুণ সহজাত সংস্কারের মত মজ্জাগত হইয়া গিয়াছিল, সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জ্জন এবং অসাধারণ সহিষ্ণুতা তাহাদের অন্যতম। বৈষয়িক ব্যাপারে অনেক সময়ে ইদানীং তিনি নিজে কিছু করিতেন না।—তাঁহার নামে কুমারমহাশয় "এবং কোম্পানির" আদেশই চলিয়া যাইত। ইহাতে অনভিজ্ঞ লোকেরা না বুঝিয়া তাঁহার বৈষয়িক বুদ্ধির দোষ

দিতেন। কিন্তু এই সময়ে আপনার সকল স্বার্থ বলি দিয়া, রাজকার্য্যে নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত মুছিয়া ফেলিতে যে দুর্লভ মানসিক শক্তির পরিচয় নিত্য তাঁহাকে দিতে হইত, যথার্থই তাহা বিস্ময়কর। তাহাই প্রকৃতি বীরত্ব—এবং স্ত্রীপুরুষনির্ব্বিশেষে অনুদিন চারিত্রপূজার নিদানীভূত।

একদিন রাজান্তঃপুরে গিয়া দেখি ,মাতা কতকগুলি কাগজে দস্তখত করিতেছেন, তাঁহার বাল্যকালের শিক্ষক বৃদ্ধ ঈশান সেন মহাশয় তাহাতে মোহরের ছাপ দিতেছেন। কি কথায় মহারাণী বলিলেন, "কেহ আমার মোহর লইয়া কোন অনিষ্ট করিবে, এ সন্দেহ কেন বা আমার মনে স্থান পায় না। আমার মোহর ঈশান সেন আমার সাক্ষাতে-অসাক্ষাতে এ-বাড়ীতে এবং ও-বাড়ীতে করিয়া থাকে। সে-বার কে একজন জালিয়াৎ এই মোহর জাল করিয়া * * ও * * এর নাম করিয়াছিল।"

ফলত সকলের প্রতি বিশ্বাস তাঁহার জীবনের অন্নপান ছিল। দুঃখের বিষয়, কাহারও কাহারও

ব্যবহারে সেই বিশ্বাস শেষের দিকে কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। মাতা সাংসারিক-বৈষয়িক সকল কথাই আমায় বলিতেন। কুমারের দলের প্রধান কোন ব্যক্তির কথায় একদিন আমি বলিলাম যে, "তাঁর কথাবার্ত্তা শুনিয়া বোধ হয় যে, উদ্দেশ্য ভাল, তবে বুঝিতে না পারিয়া যা করুন।" মা বলিলেন যে, "পূর্ব্বে আমি বড় বিশ্বাস করিতাম, কিন্তু * * হইতে বিশ্বাস একেবারে গিয়াছে। রাজসংসারের হিতকারী হইতে পারে, কিন্তু আমার অহিতকারী। খালিসার সেলামী তহবিল যে আমার হাত হইতে লওয়া হইল, উহার পরামর্শ ব্যতীত তাহা হইতে পারিত না। * * আমায় ক্ষমতাশূন্য করা তাহার ইচ্ছা, তাহা সফল হইয়াছে।" তাঁহার অনুগত চির-উপকৃতেরা পর্য্যন্ত মহারাণীকে বিপদ্‌গ্রস্ত করিতেছে বুঝিয়া আমি বড় দুঃখিত হইলাম। বলিলাম, "শেক্‌স্‌পীয়রের ওথেলো-নাটকে নায়িকা ডেস্‌ডিমোনা সখীকে কহিয়াছিলেন, সংসারে কি অবিশ্বাসের ভাব থাকিতে পারে ? মার সাক্ষাতে বোধ হয় বলা উচিত হয় না, কিন্তু অনেক

সময়ে তাঁহার ব্যবহারে ডেস্‌ডিমোনার সেই কথা আমার মনে পড়ে। অতএব তাঁর মনে যখন সন্দেহ হইয়াছে, তখন ব্যাপার সহজ নহে।" মা বিষাদের হাসি হাসিলেন এবং ডেস্‌ডিমোনার বাক্যের প্রশংসা করিলেন। বলিলেন, "পাপের ভাব মনে আসে না, এমন কেহ নাই, তবে তাহা দমন করাই মহত্ত্ব।"

কুমারবাহাদুরের শ্বশুরমহাশয় প্রথম-প্রথম জামাতার কাছে প্রতিপত্তিলাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে তদীয় দলবলের প্রভাবে তাহা ভাসিয়া গিয়াছিল। কুমার আর তাঁর কোন কথা শোনেন না দেখিয়া, শেষে তিনি আমায় ধরিয়া বসিলেন যে, মহারাণীকে তাঁহার পক্ষ হইতে সকল বৃত্তান্ত বলিতে হইবে। কথাবার্ত্তা আমার যোগে হইলে মন্ত্রভেদের সম্ভাবনা থাকিবে না, অথচ আমি সকল কথা বুঝাইয়া মহারাণীমাতাকে বলিতে পারিব, ইহাই অবশ্য তাঁর মনের ভাব। আমি কিন্তু একটি সর্ত্তে এই ব্যাপারে লিপ্ত হইতে অঙ্গীকার করিলাম—অনুরোধ ন্যায়সঙ্গত এবং মহারাণীমাতার হিতজনক হওয়া চাই। আমার

সঙ্গে কথাবার্ত্তার পর তিনি আমার দ্বারা মাতার নিকট এক পত্র পাঠাইলেন। পড়িয়া তিনি বলিলেন, "তুমি যা বলিয়াছিলে সত্য, সার কথা আছে বটে। বিশেষ কয়টিতে আমার নিজের মঙ্গলের কথা আছে। কিন্তু আমি কি করিব? আর উহাতে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা নাই। এখন উঁহারা চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু প্রথমে অন্য চেষ্টা পাইয়াছিলেন। তখন এরূপ করিলে আর এমন হইত না।" অন্যান্য কথার পর বলিলেন, "রায়মহাশয়ের কথার উত্তর কাল দিব। একটু সকালে চারিদণ্ডের সময় তুমি আসিও।"

পরদিন প্রাতে রাজবাটীতে গিয়া শুনিলাম, বধূরাণী মার কাছে আছেন। তিনি নিজের প্রকোষ্ঠে গেলে আমায় অন্তঃপুরে যাইবার আদেশ হইল। মহারাণীমাতা কল্য যে কথা বলিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা বলিলেন। আমায় বুঝাইলেন যে, কুমারের শ্বশুরের কথায় সার আছে সত্য বটে, কিন্তু এক্ষণে তিনি নিজে এতদূর অগ্রসর হইয়াছেন যে,

আর ফিরিতে পারেন না। লোকে মনে করিতে পারে যে, মহারাণী নির্ব্বুদ্ধিতাবশত নিজের বিপদ্ নিজে ঘটাইয়াছেন ; তাহা সত্যও হইতে পারে। কিন্তু তিনি নিজে পূর্ব্ব হইতে সকলই অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। কেবল পাছে বিবাদ বাধে, পাছে কুমার কিছুতে অসন্তুষ্ট হয়, এইজন্যই তিনি বরাবর কিছুতেই আপত্তি করেন নাই। ইহা তিনি বুঝিতে পারেন যে, তিনি একটু বক্র হইলে সকলই ফিরিতে পারে। কিন্তু আর তাহা করিতে তিনি ইচ্ছুক নহেন।—এতদূর্ এক্ষণে অগ্রসর হইয়াছেন যে, আর পশ্চাদ্গামী হওয়া অসম্ভব। মা আবার বলিলেন, "রায়মহাশয় পূর্ব্বে ঠিক্ বিপরীত চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কুমার ত আগে জমিদারী কাজকর্ম্মে বড় একটা আসিত না। কেবল কুশিক্ষায় এখন সকল শিখিয়াছে।" মহারাণী অনুরোধ করিলেন যে, আমি মিষ্ট করিয়া সকল কথা যেন তাঁহাকে বুঝাইয়া বলি। প্রথমে যখন কথা হইতেছিল, তখন * * সান্যালের মাতা কাছে ছিলেন। তিনি দু'একটি

কথা বলিতে লাগিলেন। মহারাণীমাতা একবার বলিলেন,—"কুমার আমার অবাধ্য নহে। আমি একাকী থাকিলে এ কথা বলিতেন না, কিন্তু অন্যের সমক্ষে না বলিলে সংসার টিকে না। সান্যালের মাতা হাসিলেন, বলিলেন, "কর্ত্তা আপনি, ও কথা বলিলে শুনিব কেন? অবাধ্য আর কাহাকে বলে? আপনি বলিয়াই সকল শোভা পাইল।" মা অপ্রতিভের হাসি হাসিলেন।

জেলার মাজিষ্ট্রেট্ কলেক্টর যেদিন আসিয়াছিলেন সেইদিনকার কথা। আমি অন্যান্যের সহিত মার কাছে বসিয়া আছি, সংবাদ আসিল, সাহেব ইংলিশ্ ম্যান্ চাহিয়াছেন। তাহা পাঠাইবার বন্দোবস্ত হইয়া গেলে পর প্রচণ্ডমহাশয়ের পুত্র মার পাঠের জন্য চিঠির ফাইল লইয়া আসিল। তাহাতে তিনি বলিলেন, "এ সব পত্র ত আমি কয়মাস হইতে দেখি না, তবে আবার কেন?" পত্রের ফাইল হাতে লইয়া প্রচণ্ডমহাশয়ের একখানি চিঠি দেখিতে পাইলেন। আবার বলিলেন "হাঁ, একখানি চিঠি দেখিবার

যোগ্য বটে।" পরে আমায় কহিলেন, "আমি বলিয়া দিয়াছি যে, নাটোরের রাণীদের, প্রচণ্ড-মহাশয়ের, ছোট-তরফের এবং কাশীর বাড়ীর দরুণ কোন কথা থাকিলে শ্রীনাথ ভাদুড়ীর পত্র যেন আমায় পড়িতে দেওয়া হয়।"

১৮

সেকালে ইংরেজ রাজপুরুষেরা সম্ভ্রান্ত জমিদার-গৃহে দর্শন দিলে উভয়পক্ষে বাস্তবিক যে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও বিশ্বস্তভাবের আদানপ্রদান হইত, গত বিশ-বৎসরের ভিতর দেখিতে দেখিতে তাহা অন্তর্হিত হইয়াছে। কারণ যাহাই হউক, সদ্ভাববিনিময়ের সেরূপ সুযোগ ও উপলক্ষ্য এখনকার দিনে অন্তত পূর্ব্বেকার মত আর আপ্যায়ন এবং উৎসাহের সঞ্চার করে না। মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবী নিজের অলৌকিক দানশীলতা এবং চরিত্রগুণে গভর্মেণ্টের সম্মানলাভ করিয়াছিলেন,—কখন তাহার ভিখারী ছিলেন না। সরকারের দত্ত উপাধিতে ভূষিত হইয়া কিরূপ অনাসক্তভাব তিনি

প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় একাধিকবার আমরা দিয়াছি। অতএব রাজপুরুষদের অনুকূল-দৃষ্টির জন্য কখন তিনি ব্যস্ত ছিলেন না। কিন্তু দেশীয় প্রকৃত ভাললোকদের প্রতি তাঁহার যেমন অকপট শ্রদ্ধা ছিল, সজ্জন বিদেশী রাজকর্ম্মচারী-দিগকেও তেম্‌নি তিনি মান্য করিতেন। তাঁহারা পুটিয়ায় আসিলে মহারাণী আত্মীয়সমাগমতুল্য প্রীতিলাভ করিতেন।

সম্ভ্রান্তবংশীয় রাজপুরুষদের কেহ কেহ সস্ত্রীক তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিতে যাইতেন। সুপ্রীম্‌-কোর্টের প্রসিদ্ধ জজ্‌ সার্‌ গোডিমন্‌ ওয়েল্‌সের ভ্রাতুষ্পুত্র ওয়েল্‌স্‌ সাহেব রাজশাহীর মাজিষ্ট্রেট্‌-কলেক্টর হইয়া আসিলে একবার স্বীয় সহধর্ম্মিণী সহ পুটিয়ায় আগমন করেন। এই মহিলা চব্বিশ-পরগণার ভূতপূর্ব্ব কর্ত্তব্যনিষ্ঠ জজ নাটোরসাহেবের কন্যা এবং দয়াদাক্ষিণ্যাদিগুণে লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিলেন। বালবিধবা মহারাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার কথায়-বার্ত্তায় ইনি পরম

আপ্যায়িত হইয়াছিলেন। তখন মাতার বয়ঃক্রম বিশ বৎসরের অনধিক। মেমসাহেব তাঁহার কমনীয়-মূর্ত্তি এবং মধুর চরিত্রে এরূপ প্রীত হইলেন যে, হৃদয়াবেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া বলিয়া বসিলেন—"রাণীসাহেব, আপনি কেন বিবাহ করুন না!" হাসিয়া মহারাণী তাঁহার অপার্থিব মাধুর্য্য এবং সারল্যের সহিত গৃহাগতা বিদেশিনীকে বুঝাইয়া দিলেন যে, হিন্দুমহিলার পক্ষে সে চিন্তাও ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ।

রেভিনিউ বোর্ডের ভূতপূর্ব্ব মেম্বর স্বর্গীয় গৃম্‌লিসাহেব মহারাণীমাতাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন এবং সর্ব্বদা সুখে-দুঃখে তাঁহার সংবাদ লইতেন। কুমারের মৃত্যুতে এবং মহারাণীর পরলোকগমনের পর তিনি যেরূপ শোকপ্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা পরমাত্মীয়ের পক্ষেই সম্ভব। জেলার কলেক্টররূপে গৃম্‌লি সর্ব্বত্র গরিব প্রজার মা-বাপ ছিলেন, কখন কাহারও রুজি মারিতেন না এবং বিস্তর লোকের অন্নসংস্থান করিয়া দিতেন।

এই সকল গুণে মহারাণী তাঁহাকে আজীবন আন্তরিক সম্মান করিতেন।

প্রসঙ্গক্রমে গৃম্‌লিসাহেবের কথা যদি উঠিল, তবে তাঁহার সম্বন্ধে আরো কিছু না বলিলে এই চিত্র অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। সাহেব যখন হাবড়ার মাজিষ্ট্রেট, বঙ্কিমবাবু তখন দিনকতক তাঁহার অধীনে কাজ করিয়াছিলেন। কাছারীর কাজ শেষ হইলে রোজ তিনি কলিকাতায় চলিয়া আসিতেন, হাবড়ায় পৃথক্ বাসা করেন নাই। একদিন একটা খুনী আসামীর একরার লইবার জন্য সন্ধ্যার পর বঙ্কিম-চন্দ্রের তলব পড়িল। কিন্তু তিনি যাইতে পারেন নাই, উপরন্তু আদেশবাহক চাপরাসীটাকে কি কটুকাটব্য বলিয়াছিলেন। মাজিষ্ট্রেট ইহাতে চটিয়া-গিয়া আদেশ দিলেন, তাঁহাকেও অন্যান্য ডেপুটিদের মত হাবড়ায় বরাবর থাকিতে হইবে। ইহা লইয়া দুজনের ভিতর দিনকতক খুব মনোমালিন্য ঘটিল। ভিতরের কথা তখন আমি জানিতাম না, বরং রাজশাহীতে গৃম্‌লির সহিত কথাপ্রসঙ্গে বুঝিয়া-

ছিলাম, তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের একজন অনুরক্ত ভক্ত পাঠক। কাজেই বঙ্কিমবাবু কথায়-কথায় যখন একদিন আমায় বলিলেন, "সাহেবটার তুমি অত সুখ্যাতি কর—আমার সঙ্গে বড় লাগিয়াছে," তখন আমি বিস্মিত হইয়াছিলাম। কিছুদিন পরে আপনা হইতে আবার তিনি বলিলেন, "তোমার কথাই ঠিক, গৃম্‌লিসাহেব দিব্য লোক। সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া সব ভার আমাকেই দিতেছেন!" এই সদ্ভাব যে ক্রমে বন্ধুতায় পরিণত হইয়াছিল, তাহা তাঁহার রাখালকে পত্র দিয়া সাহেবের কাছে প্রেরণ করাতে আমি বুঝিয়াছিলাম। কেন না, সহজে এবং সাধারণত বঙ্কিমচন্দ্র সাহেবসুবার সইসুপারিসের ধার ধারিতেন না।

তিনি (গৃম্‌লিসাহেব) পুটিয়ার রাজবাড়ীতে এই ক্ষুদ্র লেখকের পরিচয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তার পর রাজকার্য্যে নানাস্থানে আমাদিগকে মিলিত হইতে হইয়াছে, কিন্তু অধঃস্তন কর্ম্মচারী হইলেও পূর্ব্বের সে সম্ভ্রম বরাবর আমার প্রতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিতেন।

আমার মনে হইত, মহারাণীমাতার স্মৃতির প্রতি সম্মানই তাহার মুখ্য কারণ। তবে ইহা বলা আবশ্যক, গৃম্‌লিসাহেবের সহৃদয়তা ছোট-বড় সকলকেই আকৃষ্ট করিত। এরূপ ঘটিয়াছে, আমি কাছারী হইতে পদব্রজে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছি, সাহেব—তখন বিভাগীয় কমিশনর—হঠাৎ সে পথ দিয়া যাইতে যাইতে আমায় দেখিতে পাইলেন এবং গাড়ি থামাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "Come up, I shall drive you." তার পর আমায় গাড়িতে তুলিয়া-লইয়া গল্প করিতে করিতে বাসায় পৌঁছাইয়া দিলেন। গৃহে সাক্ষাৎ করিতে গেলে কি যত্ন যে করিতেন, তাহার আর কি বলিব। গার্ডেনপার্টি (Garden party) প্রভৃতিতে কত বড় সাহেব-সুবাদের সহিত এরূপ সমকক্ষভাবে আমাকে পরিচিত করিতেন যে, তাহাতে আমায় খানিকটা অপ্রস্তুত হইতে হইত। দেখা হইলে অন্যান্য কথার পর সাহিত্যালোচনার কথা তুলিতেন এবং জিজ্ঞাসা করিতেন, "এ দেশের সাধারণ গান ও গল্প (folk-lore) সম্বন্ধে কিছু লেখ

না কেন ?" আমি অবসরাভাবের ওজর করিলে হাসিয়া উঠিতেন,—তাঁহার কেমন ধারণা ছিল যে, রাজকর্ম্মচারীরা ইতিহাস এবং সাহিত্যাদির গবেষণা করিলে তাহাতে শাসনকার্য্যেরই সহায়তা হয়। তিনি অধঃস্তন বিচারকদের দৃঢ় স্বাধীনভাবকে উৎসাহ দিতেন এবং তোষামোদ দুচক্ষে দেখিতে পারিতেন না। মুণ্ডা-বিদ্রোহের প্রথম আমলে কোন-এক মকদ্দমায় উপরিওয়ালার জেদ থাকিলেও একজন এদেশীয় বিচারক যথেষ্ট প্রমাণের অভাবে অভিযুক্তদের ছাড়িয়া দিলেন। ইহাতে তাঁহাকে ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর বিরাগভাজন হইতে হইয়াছিল। গৃম্‌লিসাহেব তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন, "আপনার উপরিওয়ালা এই মকদ্দমায় বাদী মাত্র। আপনি যথার্থই সুবিচার করিয়াছেন।" একবার এক জেলা পরিদর্শন করিয়া ফিরিয়া-আসার পর পার্সনেল আসিষ্টাণ্টের সহিত সাহেব নানা গল্প করিতেছিলেন। একজন কর্ম্মচারীর অতিরিক্ত চাটুকারিতায় বড় বিরক্ত হইয়া আসিয়াছিলেন।

তাহার কথা তুলিয়া বলিলেন—"He is a Darbari of Darbaris—a matter very greatly to be regretted." (ভারি দুঃখের বিষয় যে, লোকটা বড় দরবারী।) ইঁহার সুন্দর লিপিকুশলতার সঙ্গে ভাবুকতা এবং রসিকতার সমাবেশ হওয়ায় মণি-কাঞ্চনযোগ হইয়াছিল। ছোটনাগপুর হইতে বোর্ডে আসার অনতিপূর্ব্বে রাঁচি ইংরেজী-স্কুলগৃহে বিদ্যা-সাগরমহাশয়ের প্রতিমূর্ত্তি-উন্মোচন উপলক্ষে ইনি যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহার প্রত্যেক কথায় সুলেখক ও সুবক্তাসুলভ এই গুণগুলি মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। ছেলেদের প্রাইজ বিতরণ করিবার সময় বলিলেন "দেখিতেছি, নিয়মিতরূপে স্কুলে আসার জন্যও একটি বালককে পুরস্কৃত করা হইয়াছে। সে হিসাবে আমারও একটা পুরস্কার পাওয়া উচিত। কেন না, গত সাতবৎসর এইরূপ উৎসবে আমার ন্যায় কেহ ধারাবাহিকরূপে যোগ দেন নাই!" ঐ দিন অপরাহ্নে স্কুলের প্রধানশিক্ষক-মহাশয় কোন কার্য্যোপলক্ষে সাহেবের সঙ্গে দেখা

করিতে গিয়াছিলেন। কমিশনার হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "Oh, you have survived my speech ?" (আমার বক্তৃতার পরও আপনি বাঁচিয়া আছেন ?) আর একবার রাঁচি মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস্‌চেয়ারম্যান আয়কাৎমহাশয় চিঠি লিখিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। তাড়াতাড়িতে চিঠির শিরোনামায় গৃম্‌লির পরিবর্ত্তে গৃম্‌লে লেখা হইয়া গিয়াছিল। আয়কাৎমহাশয়কে দেখিয়া সাহেব হাসিয়া সুধাইলেন, "আরকাটিমহাশয়, আছেন কেমন ?" নিজেকে কুলিব্যবসায়ীর মত সম্বোধিত হইতে শুনিয়া তিনি যেন আকাশ হইতে পড়িলেন এবং গম্ভীরভাবে বিভাগের হর্ত্তাকর্ত্তাকে বুঝাইতে প্রবৃত্ত হইলেন যে, তিনি আরকাটি নহেন, আয়কাৎ। গৃম্‌লিসাহেব সহাস্যে বলিলেন, "জানি, কিন্তু আমিও গৃম্‌লি—গৃমলে নহি !"

বর্ষাকালে একবার কলেক্টর রডাকসাহেবের পুটিয়াপ্রদর্শনের কথা বলিতেছিলাম। ইংরেজীনবিশ কর্ম্মচারী তখন সদরে কেহ উপস্থিত ছিলেন না,

তবে পিতৃদেব পেনশন লইয়া পুটিয়াতেই ছিলেন। আমার সমক্ষেই মহারাণীমাতা কুমারকে অনুযোগের ভাবে বলিলেন, "তোমার রাজসংসারে এমন লোক এখন কেহ নাই যে, সাহেবের সঙ্গে কথা কয়।" কুমার উত্তর করিলেন—"কেন দেওয়ানজী আছেন, শ্রীশবাবু আছেন।" মা হাসিলেন,—"মনে কর, ইঁহারা যদি এখানে উপস্থিত না থাকিতেন!" কুমার অপ্রতিভ হইলেন।

পরদিন খুব ভোরে হস্তীতে আরোহণ করিয়া আমি কলেক্টরসাহেবকে লইয়া আসার জন্য পাইক-পাড়ায় তাঁহার বোটে উপস্থিত হইলাম। সাহেব মহারাণীর ও কুমারের এবং আমাদের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার সসম্পর্কীয় সঙ্গীটির সহিত হাতীতে উঠিলেন। পথ প্রায় দুইমাইল, নানা কথাবার্ত্তায় দেখিতে দেখিতে আমরা রাজবাড়ীতে পৌঁছিলাম। সেখানে কলেক্টরকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য পিতৃদেব উপস্থিত ছিলেন। কুমারকে সাহেব যে সব কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, পিতাঠাকুর ও আমি উভয়ে

তাঁহার নিকট শুনিয়া তাহার উত্তর ইংরেজীতে দিলাম। কথার অধিকাংশ মামুলি।—কেমন আছেন, ইংরেজী পড়িতেছেন কি না, ঘোড়া কেমন আছে, কয়টা ঘোড়া ইত্যাদি। বৈঠকখানায় স্বর্গীয় রাজা-বাহাদুরের ও তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গদের এক তৈলচিত্র লম্বিত ছিল। রাজার ও পিতৃদেবের তস্‌বীর দেখিয়া সাহেব সন্তুষ্ট হইলেন। স্থির হইল, আগামী কল্য প্রাতে সাহেবের আত্মীয়টিকে লইয়া কুমার ব্যাঘ্র-শিকারে বাহির হইবেন।

মহারাণীমাতার আদর-অভ্যর্থনায় প্রীত হইয়া কলেক্টরসাহেব থানার দিকে গেলেন। প্রথমত ডিস্‌পেন্‌সরি দেখিলেন। আমি বরাবর সঙ্গে। অবসর বুঝিয়া মহারাণীর আদেশমত বিষয়ভার কুমারের হস্তে দিয়া তাঁহার কাশীবাসের প্রস্তাব উপস্থিত করিলাম। সাহেব অবহিত হইয়া সকল শুনিলেন এবং প্রতিশ্রুত হইলেন, ছোটলাট এবং কমিশনর আসিলে তিনি অবশ্য বিশেষ চেষ্টা পাইবেন।

ইহার পরে আমরা চারি-আনির রাজবাড়ীতে গেলাম। গভর্মেণ্টের পেন্‌শন্‌প্রাপ্ত একজন রাজ-কর্ম্মচারীর সঙ্গে পিতৃদেব সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ছোটলাট টম্‌সনের আসন্ন রাজসাহীপরিদর্শনের কথা উঠিল। সাহেবের প্রশ্নোত্তরে পিতাঠাকুর মহাশয় বলিলেন যে, তিনি যখন রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণের দেওয়ান, তখন বর্ত্তমান লেপ্টেনাণ্ট গভর্ণর বোয়ালিয়ার মাজিট্রেট্‌-কলেক্টর ছিলেন। তিনদিন তাঁহাকে আহ্বান করিয়া কলিকাতার ওয়ার্ডস্‌ ইনষ্টিটিউট্‌ সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। টম্‌সন্‌সাহেব তখন ওয়ার্ডস্‌ ইনষ্টিটিউটের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন, আমরা বলিলাম, এতদিনে তাহার ফল হইয়াছে। সেখানে, কি জন্য বলা যায় না, সকলেই প্রায় দুর্নীতিপরায়ণ হইত। রাজেন্দ্রবাবু যোগ্যতায় দেশীয়দের মধ্যে অগ্রগণ্য সন্দেহ নাই, কিন্তু সুশিক্ষক বলিয়া তাঁহার নাম ছিল না। সাহেব জমিদারের ছেলেদের স্কুল-কলেজে পড়ার কত উপকারিতা, তাহা বলিয়া চারি-

আনির পোষ্যপুত্র এবং রাজকন্যার পুত্রদ্বয়কে ডাকাইয়া আনাইলেন। তাহাদের সহিত কথায়-বার্ত্তায় তাঁহার খানিকটা বেশ আমোদে কাটিল।

বৈকালে মহারাণীমাতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কলেক্টরের সঙ্গে কথাবার্ত্তা যাহা হইয়াছিল, জানাইলাম। শুনিয়া তিনি বলিলেন, লেপ্টেনাণ্ট গভর্ণর আসিলে কথাটা তাঁহার মনে করিয়া দিও। মাতার স্নেহে আবাল্য লালিতপালিত ত্রৈলোক্য এতক্ষণে আসিল এবং বলিল, "অম্‌নি যা বলেন বলুন, সাহেবদিগকে কিছু বলাইবেন না।" মা বলিলেন, "যাহা এ পর্য্যন্ত বলাইয়াছি, সকলেই তা জানেন। তোমরা * * র দোষ দিয়াছিলে, কিন্তু আমার সেই দরখাস্ত মহেন্দ্র সান্যালের লেখা। * * র দ্বারা দ্বিতীয়বার নকল করাইয়া দিয়াছিলাম। মাজিষ্ট্রেটের পত্রোত্তর * * মৈত্র লিখিয়া দিয়াছিলেন।"

১৯

সংস্কৃতসাহিত্য এবং পুরাবৃত্তে মৃগয়াব্যাপারের যেরূপ বিশদ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে শিকার-

প্রিয় ইউরোপবাসীদেরও বিস্ময় উৎপাদন করিয়া থাকে। ফলত এই "অহিংসা পরমো ধর্ম্মের" দেশে একদিন আমোদের জন্য জীবহত্যার আসক্তি ছোট-বড় সকল শ্রেণীর ভিতর এরূপ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে, শাস্ত্রের অনুশাসন পর্য্যন্ত তাহাকে একটা উৎকট ব্যসন বলিয়া ধিক্কৃত করিয়াছে। সভ্যতার কোন্ যুগে সেরূপ শোণিতপাত রাজচক্রবর্ত্তীদের মধ্যেও নিন্দনীয় হইয়া উঠে, পুরাতত্ত্ববিজ্ঞান তাহার মীমাংসা করিবে। কিন্তু ইহা নিঃশঙ্কচিত্তে বলা যাইতে পারে, পাশ্চাত্যজাতিদের মানসিক ইতিহাসে এখনও তাহার রেখাপাত হয় নাই। ইহাতে যদি কেহ সংশয়প্রকাশ করেন, তাঁহাকে সাহেবদের সাধারণত রবিবাসরীয় কীর্ত্তিকলাপ আলোচনা করিতে হইবে। সেদিন খৃষ্টোপাসকদের ভিতর কয়জন যিশুর ঈশ্বরপ্রেম হৃদয়ঙ্গম করিয়া ধন্য হন? বস্তুত রবিবারে মৃগয়াযাত্রা অন্তত এদেশে পাশ্চাত্য-সভ্যতার অঙ্গীভূত হইয়া উঠিয়াছে। কয়বৎসর পূর্ব্বে কথায় কথায় এক পাদরীসাহেবের সঙ্গে এই

সম্বন্ধে আমার আলোচনা হইয়াছিল। তিনি আমাদের মতে সায় দিয়া বলিয়াছিলেন, এমন অকার্য্য নাই যাহা ভগবান্‌কে বিশেষভাবে স্মরণ করিবার এই দিনে এক্ষণে আচরিত হয় না।

মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবীর জীবে দয়া কত গভীর এবং প্রসরণশীল ছিল, সে পরিচয় আমরা দিয়াছি। কুমার একটু বড় হইয়া রাজবাটীর চৌকীতে একবার পাখী মারিতে উদ্যত হইলে মাতার কাছে ভর্ৎসিত হইয়াছিলেন। কিন্তু সে অনেকদিনের কথা। এখন হাতের চেয়ে আম বড় হইয়া উঠিয়াছিল। রডাক্‌সাহেবের আত্মীয় শিকারে যাইবার প্রস্তাব করিলে কুমারমহাশয় উৎসাহে তাহাতে সম্মত হইলেন, মহারাণীমাতার আদেশের অপেক্ষা করিলেন না। অনিচ্ছায় পরে তাঁহাকে সম্মতি দিতে হইল।

পরদিন প্রাতে আমাকেও শিকারে কুমার বাহাদুরের সঙ্গী হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইল। নহিলে সাহেবের সঙ্গে কথা চলিবে না। পোষাক

আঁটিয়া রাজবাড়ী গেলাম। গোবিন্দের বাড়ীতে যাত্রাগান হইতেছিল, সকলে সেজন্য ব্যস্ত। মাজিষ্ট্রেটসাহেব আত্মীয় সহ আজও গজারোহণে দেখা দিলেন। হাসিয়া আমায় বলিলেন, তিনি ভরসা করেন যে, আমাদের উত্তম শিকার মিলিবে। ছোটসাহেবের প্রশ্নোত্তরে আমি বলিলাম যে, জীবনে সেই আমার প্রথম মৃগয়াযাত্রা, পূর্ব্বে বন্দুক চালাইবার অভ্যাস করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু সে অল্পদিনমাত্র। সাহেবটির ইচ্ছা ও অনুরোধ— আমি তাঁহার সঙ্গে থাকি। প্রথমে সম্মত হইয়াছিলাম, সুতরাং যখন তিনি প্রস্তাব করিয়া বসিলেন যে, "চারজমার" উপর হইতে ব্যাঘ্রশিকার ভাল হয় না, অতএব আমরা শুধু গদিতেই যাইব; আমি তখন আর পশ্চাৎপদ হইতে পারিলাম না। সঙ্গে একখানি কিরীচমাত্র লইলাম। সেরূপ অরক্ষিতাবস্থায় যাইতে আমার ন্যায় শিকারে অব্যবসায়ীর সাহসে কুলাইত কি না বলিতে পারি না, কিন্তু

আমার মনে কোন আশঙ্কা হয় নাই। আমাদের আত্মীয় এদেশীয়দের মধ্যে প্রথম পুলিস সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট সুপণ্ডিত জগদীশনাথ রায় মহাশয় বলিতেন,"আসল বল মনের বল। ইউরোপে ফরাসী-সেনার মত দক্ষ যোদ্ধা আর নাই। অন্যান্যদের তুলনায় তাহারা আমাদের মতই তালপাতার সিপাহি মাত্র, কিন্তু মানসিক বলেই সমরক্ষেত্রে বীরত্বে তাহারা অদ্বিতীয়। আমাদের মনের বীর্য্য বাড়ুক, শৌর্য্য আপনিই আসিবে।" এক্ষণে স্বর্গগত আত্মীয় তখনও জীবিত, সরকারী চাকরী হইতে অবসরগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেদিন তাঁহার কথাকয়টি দৈববাণীর মত আমার হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল।

ছোটসাহেবটির নাম রস্। যাইতে যাইতে তাঁহার সঙ্গে নানা কথা হইল। তামাক-সেবনের কথায় মদ্যপানের প্রসঙ্গ উঠিল। তিনি বলিলেন যে তিনি মদ্য স্পর্শও করেন না, মাতালদের দুর্দ্দশা দেখিয়া তাঁহার চৈতন্য হইয়াছে। আমি কহিলাম, "শুনিয়াছি কিঞ্চিৎ মদ না হইলে ইংরেজদের

আহার সম্পূর্ণ হয় না, অন্তত একগ্রাস্ ‘বিয়ার’ও চাই।” সাহেব—“সেটা ভুল, অনেকে মদ স্পর্শও করে না। আবার অনেকে এমন আছে, মদ নহিলে যাহারা জল পর্য্যন্ত পান করে না।” কুমার বাহাদুরের হস্তী আমাদের কিছু অগ্রে যাইতেছিল, তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া রস্‌সাহেব বলিলেন যে, রাজকুমারকে দেখিলেই মনে হয়, তিনি বড় অমিতাচারী। এই কথায় আমি কুণ্ঠিত বোধ করিতে লাগিলাম। কেন না, মহারাণীমাতা আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলেন, শিকারোপলক্ষে মেশামিশি হইলে সদল কুমারের শিক্ষা ও সংসর্গের কথা সাহেবদের প্রত্যক্ষীভূত হইবে।

ক্রমে আমরা পুটিয়াগ্রামের দক্ষিণদিকে জঙ্গলমধ্যে প্রবেশ করিলাম। অতি ভয়ানক নিবিড় বন। পুটিয়ার অত কাছে যে এরূপ বন থাকিতে পারে, ইহা পূর্ব্বে আমার ধারণা ছিল না। বনের সর্ব্বত্র তন্নতন্ন করিয়া খোঁজ করা হইল, বাঘ কোথাও মিলিল না। বাঘ দূর হউক, একটা শিয়ালও দেখা

গেল না। যাহা হউক, পথ পরিষ্কার ও শিকারের অন্বেষণার্থ হস্তীরা যখন বড় বড় ডাল ও সমূলে কোন কোন গাছ উৎপাটিত করিতে লাগিল, সে দৃশ্য দেখিবার যোগ্য বটে। এতক্ষণে আমার মনে হইতেছিল, শিকারে বাস্তবিক একটা আমোদ আছে। সাহেবটিকে আশ্বস্ত করিবার জন্য আমি বলিলাম, "শিকার দেখা গেল না, দুঃখ নাই; সুখ উপায়ে, লক্ষ্যে নহে।" একটু পরে আবার বলিলাম, "আজিকার এই অভিযানে আমরা বুঝিতে পারিলাম, পুটিয়ার অস্বাস্থ্যকরতার প্রধান কারণ এই বন। তিনি ম্যাজিষ্ট্রেট্‌কে বুঝাইতে পারিবেন।" এ সব 'মহীপালের গীত' ব্যর্থমনোরথ সাহেবের নিশ্চয়ই ভাল লাগিতেছিল না। তিনি শেষে পাখী মারিবার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। দুইটা ঘুঘু দেখিয়া মারিবার জন্য আমার হাতে বন্দুক দিলেন। আমার হৃদয় পূর্ণ হইল। পক্ষিজাতির ভিতর ঘুঘুদের দাম্পত্যপ্রেম আদর্শস্থানীয়। আমার হাত উঠিতেছিল না। শেষে দুইটা ঘুঘু দেখিতে দেখিতে

উড়িয়া গেল, আমিও বাঁচিলাম। বাস্তবিক হিংস্র-জন্তুদের নিধন লোকরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় হইলেও নিরীহ পক্ষীদের যথেচ্ছ হননকার্য্যের সমর্থন করা যায় না। শুনিয়াছি, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁহার মৃগয়াপ্রিয় পরমাত্মীয়দের অনুরোধ করিয়া থাকেন, "তোমরা শুক এবং পারাবত জাতীয় পক্ষীদের মারিও না। উহা অত্যন্ত নিষ্ঠুরের কার্য্য।"

বেলা অধিক হইল দেখিয়া রস্‌সাহেব বোটে ফিরিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কুমারের অভি-প্রায়, আমরা আরো খানিকটা অপেক্ষা করি, কিন্তু সাহেব সে অনুরোধ পালন করিতে সম্মত হইলেন না। কুমারমহাশয় ইহাতে রাজশাহীর খাঁটী বাঙ্‌লায় যে তীব্র মন্তব্যটুকু প্রকাশ করিয়াছিলেন, ইংরেজীতে অনুবাদিত হইলে উহা একটা হাতাহাতির সৃষ্টি করিত। অতএব বন হইতে ফিরিয়া আমি যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। কুমার সদলে রহিয়া গেলেন। পথে আসিতে আমরা গোটাকতক বন্দুকের আওয়াজ শুনিতে পাইয়াছিলাম মৃগয়া-

প্রিয় রস্ সেজন্য বৈকালে আমায় চিঠী লিখিয়া জানিতে ঔৎসুক্যপ্রকাশ করিয়াছিলেন, আর কোন শিকার পাওয়া গিয়াছিল কি না?

প্রাতে মহারাণীমাতার সহিত সাক্ষাতের সময় ছিল না। সেজন্যও বটে, আর শিকারের খবর জানিবার জন্য তাঁহার একটা কৌতূহল ছিল বলিয়াও বটে,অপরাহ্নে তাঁহাকে প্রণাম করিতে গেলাম। মাতা যেরূপ আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তাহা যে অমূলক নহে, ইহা আমায় স্বীকার করিতে হইল। তিনি আবার বলিলেন, "কুমারের দল একেবারে কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান-বিহীন,সে কারণে 'কোকনের' জন্য সর্ব্বদা তাঁর ভয় করে।" বাস্তবিক ভবিষ্যদ্বাণীর মত তাঁহার এই কথা পরে ফলিয়া গিয়াছিল। তাঁহার কতটা দূরদর্শন ছিল, ইহাতে কতক বুঝা যাইবে। সবই তিনি নখদর্পণে দেখিতেন এবং বুঝিতেন—তবে অত্যন্ত চক্ষুলজ্জা-বশত সহসা কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেন না।

২০

"পৃথিবীর মত সর্ব্বসহা হও", "গঙ্গার মত শীতল

হও,” বঙ্গীয় প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধা গৃহিণীরা অন্যান্য শুভা-
কাঙ্ক্ষার সহিত এই বলিয়া আজিও কুলকন্যা এবং
বধূদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন। এই সর্ব্ব-
সহ ভাব এবং এই শীতলতা মহারাণীমাতার চরিত্রকে
বড় মধুময় করিয়া তুলিয়াছিল। এই গুণ বিশেষ
ভাবে তিনি স্বীয় মাতৃদেবী হইতে লাভ করিয়া-
ছিলেন। শেষোক্তার ভাস্কর্য্যবৎ স্থির ধীর মূর্ত্তি
তাঁহার হৃদয় মাধুর্য্য অবিকল প্রতিবিম্বিত করিত।
কথা খুব অল্প কহিতেন, কিন্তু তাহা কারুণ্যে এবং
স্নেহশীলতায় শ্রোতার হৃদয়ে অমৃত বর্ষণ করিত।
সহিষ্ণুতা এতদূর যে মাল বৈদ্যের দ্বারা চক্ষের ছানি
তুলিবার সময়ও যন্ত্রণাসূচক মুখবিকৃতি কি কোন-
রূপ শব্দ করেন নাই। সচরাচর যেরূপ বসিয়া
থাকিতেন, ঠিক সেই ভাবেই ছিলেন।

মহারাণীমাতার সহ্যগুণের কথা বলিতেছিলাম;
যে শিরঃপীড়ায় সাধারণত অন্যে পাগল হইয়া উঠে,
তাহা লইয়া তিনি সহজের মত লোকের সঙ্গে কথা-
বার্ত্তা কহিতেন, যেন কিছুই হয় নাই। এক দিনের

কথা বলি। অপরাহ্ণে তাঁহাকে প্রণাম করিতে গিয়াছি। বুঝিলাম কল্যকার মাথার বেদনা তেমনি আছে। একাদশীর ক্লেশে মুখ শুকাইয়াছে। পূর্ব্বদিন হবিষ্যান্ন গ্রহণের পর বমন হইয়াছিল, পেটে কিছু ছিল না, সুতরাং উপবাস দুইটি। তথাপি প্রফুল্লতার এবং দয়ার জ্যোতি মুখে দীপ্তি পাইতেছিল। কিন্তু আশৈশব আমি তাঁহার ক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়াছিলাম, আমায় বড় কিছু লুকাইতে পারিতেন না। একটুতেই বুঝিলাম যন্ত্রণা বড় কষ্টকর। বলিলাম মাথার বেদনার ঔষধ আনাইয়া দিই? মা হাসিলেন—"না আজ কাজ নাই!" আমি জেদ করিয়া বলিলাম, "কেন মা, শারীরিক, মানসিক সকল কষ্টই কি ইচ্ছা করিয়া পাইতে হইবে?" মাতা তাহাতে কেবল হাসিয়া আমার সঙ্গে একটা গুরুতর বৈষয়িক কথায় প্রবৃত্ত হইলেন।

কুমার মহাশয় যখন মহারাণীকে শ্রীবৃন্দাবনে লইয়া যাইবার প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন, সেই

সময়ের এক দিনের কথা। তখন শ্রাবণ মাস। মা পিত্রালয়ে গিয়াছেন শুনিয়া বৈকালে দেখা করিতে গেলাম। তাঁহার অসুখের কথা পূর্ব্বে জানিতে পারি নাই। আমি অন্দরে প্রবেশ করিয়া বরাবর উপরে গেলাম। পূজনীয়া শ্রীসুন্দরী দেবী ও তাঁহার জ্যেঠাই মা সেখানে ছিলেন—গৃহমধ্যে মাতা শয়ানাবস্থায়, তাঁহার জ্বর ও চক্ষুরোগজনিত মাথার বেদনা হইয়াছে। দেখিয়া আমি হটিয়া গেলাম। আমার নাম শুনিয়া মা উঠিয়া বসিলেন। সুতরাং আমায় আবার যাইতে হইল। বলিলেন বমন করিয়াছেন, শরীর ভাল নাই। কিন্তু তখনই যেন কিছু হয় নাই, এই ভাবে শ্রীবৃন্দাবনযাত্রার কথা তুলিলেন।

তাঁহার শরীর ক্রমশ খারাপ হইতেছিল। এক-দিন ভাদ্রমাসে মাতাকে প্রণাম করিতে গেলাম। কি কথায় বর্দ্ধমানের জালরাজা প্রতাপ চাঁদের কথা উঠিল। এমন সময় সংবাদ আসিল যে কবিরাজ মহাশয় আসিয়াছেন। শুনিয়া মহারাণী ত্রৈলোক্যকে

বলিলেন, তোমারই এ কাজ! এবং হাসিলেন। কবিরাজ হাত দেখিয়া কহিলেন যে জ্বর আজ আরও প্রবল। তিনি স্নান করিতে বারণ করিলেন। মহারাণী বলাইলেন—গরম জলে আজ স্নান করিবেন কাল আর করিবেন না। মাতার মূর্ত্তি দেখিয়াই বুঝিয়াছিলাম, শরীর বড় অসুস্থ, স্নান করিতে জেদ্ দেখিয়া আমি বলিলাম—কাল জ্বর প্রবল আপনিই হইবে, স্নান আর করিতে হইবে না। পরদিন প্রাতে গিয়া দেখি, তিনি বড় অসুস্থ। অনাবৃত মেঝের উপর একটি বালিশ মাথায় দিয়া শয়ন করিয়া আছেন, তাঁহার পিতার প্রাচীন বিশ্বাসী ভৃত্য বাতাস করিতেছে, অন্নদাসী মাথা টিপিয়া দিতেছে। নিতান্ত পীড়িত না হইলে মাতা কখন শয্যা গ্রহণ করিতেন না, কাহারও সেবা লইতেন না। আমি বিছানায় শয়ন না করার কারণ সুধাইলে বলিলেন যে মেঝে খুব ঠাণ্ডা। এই সময়ে তাঁহার খুল্লতাত মন্মোহন সান্যাল আসিলেন। আমরা উভয়ে মহারাণীমাতাকে বলিলাম, নিজের

অযত্নে অসুখ এত বাড়িয়া গেল। এই অসুখের জন্য আপনার ধর্ম্মচর্চ্চারও ত ব্যাঘাত হইতেছে, আজ ত আর আহ্নিক করিতে পাইবেন না? তিনি কেবল হাসিলেন, কোন উত্তর করিলেন না।

আর একদিন তাঁহার শরীর অসুস্থ হইলে অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, শীত পড়িয়াছে, তথাপি জানালা বন্ধ না করিয়াই শয়ন করেন। এজন্য আমি মাতাকে একটু অনুযোগ করিলাম। তাঁহার সমক্ষে ত্রৈলোক্যকে বলিয়া দিলাম যে দুইটা নীল কাপড়ের পর্দ্দা যেন মাথার ও পায়ের দিকের জানালার জন্য প্রস্তুত করা হয়। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে হাত পা জ্বলিতেছে। বলিলাম কাগজীলেবুর রস দিয়া মালিস করিলে তখনি শীতল হইবে। ত্রৈলোক্য লেবু আনিতে চলিল, কিন্তু মা মানা করিলেন।

আমার ধারণা হইয়াছিল যে, রাত্রের ঠাণ্ডা বাতাসে তাঁহার অসুখ সারিতেছে না। মার তাচ্ছিল্য দেখিয়া ত্রৈলোক্য পর্দ্দা প্রস্তুতের প্রতি আদৌ

মনোযোগ করে নাই, অথচ রোজ আমি তাগাদা করি। পরদিন মহারাণীমাতার শয়ন-সঙ্গিনী ব্রাহ্মণ-কন্যাদের তাঁহার সম্মুখেই জিজ্ঞাসা করিলাম জানালা খোলা ছিল কি বন্ধ ছিল ? মা হাসিয়া আপনিই বলিলেন, তিনি ঘুমাইলে কে একবার বন্ধ করিয়াছিল, পরে তিনি খোলাইয়া দিয়াছিলেন। আমি পর্দ্দার ব্যবস্থায় ব্যস্ত হইয়া উঠায় পরদিন মহারাণীর বৃদ্ধা পিসি ঠাকুরাণী বলিলেন—"পর্দ্দা হইলেই কি দিতে দিবে ? সেবার বেশী ব্যারাম হইলেও দিতে দেয় নাই !" কথাটা তাঁহার গোচরেই হইতেছিল। আমি একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া সুধাইলাম—"সত্যই মা, পর্দ্দা তৈয়ারি হলেও কি আপনি দিতে দিবেন না ?" মহারাণী হাসিলেন, আমায় খুসী করার জন্য বলিলেন—"কতক সময় দিতে দিব !"

২১

এই জীবনী-প্রসঙ্গ মধ্যে মাঝে মাঝে এ ক্ষুদ্র লেখককে তাহার নিজের কথা বলিতে হইতেছে। কিন্তু নিতান্ত যাহা না বলিলে মহারাণী মাতার

চরিত্র-চিত্র অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়, তাহারই উল্লেখ করিয়া যাইতেছি। পুটিয়ার রাজধানীর সঙ্গে আমার প্রাথমিক জীবন অবিচ্ছিন্ন ভাবে সংশ্লিষ্ট— সে অকিঞ্চিৎকর জীবনের যেটুকু গৌরবকাল তাহা সেই প্রাতঃস্মরণীয়া মাতৃদেবীর সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে। তাঁহার মহান্ আলেখ্য অঙ্কনের অবসরেই আত্মকথা অনিবার্য্য হইয়াছে, ইহা সহৃদয় পাঠকপাঠিকাকে মনে রাখিতে হইবে।

তাঁহার স্বাস্থ্য-ভঙ্গের মুখ্য কারণ যে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য এবং অনিয়ম তাহাতে কোন সংশয় নাই। কিন্তু মানসিক ক্লেশ ইদানীন্তন তাহাতে সংযুক্ত হওয়ায় পীড়ার আক্রমণ ও গতি উত্তরোত্তর দ্রুততর হইয়া উঠিতেছিল। নিজের একটা প্রধান কর্ত্তব্য কাজ ভাবিয়া আমি অন্ততঃ মোটামুটি অনিয়ম গুলার প্রতিবিধান চেষ্টা করিতাম। কিন্তু অনেক সময় সেটা অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করার প্রয়াস তুল্য বিফল হইত। যাহা হউক পুটিয়ায় যতদিন ছিলাম, আমার সামান্য শক্তিতে সেই কর্ত্তব্যপালনে

কোন ত্রুটি হইত না। তাঁহার এই অযোগ্য সন্তানের ক্ষুদ্র জীবনে সেইটুকু মাত্র সান্ত্বনা।

ইদানীন্তন মহারাণী-মাতা অনেক সময় পিত্রালয়ে থাকিতেন। একদিন তাঁহাকে প্রণাম করিতে গিয়া দেখি মা নীচে রান্না-বাড়ীতে আছেন, আমায় দূর হইতে দেখিয়া ভগ্নীসহ উঠিয়া আসিলেন এবং দ্বিতলে গেলেন। সেখানে তাঁহার মাতৃ দেবী ছিলেন। সকলকে প্রণাম করিয়া আমি তাঁহাকে সুধাইলাম—"ঠাকুর মা, আপনার শরীর কেমন?" পরে জিজ্ঞাসা করিলাম যে তিনি রীতিমত ঔষধ সেবন করেন কি না? ঠাকুরমাতা বলিলেন সে সম্বন্ধে তিনি কোন অনিয়ম করেন না। যো পাইয়া আমি তখন মহারাণীকে বলিলাম, "তবে মা আপনি ঔষধ না খাওয়া কার্ কাছে শিখিলেন?" মাতা হাসিয়া উঠিলেন। তার পর কুমারের পশ্চিমোত্তর প্রদেশে যাওয়ার প্রস্তাব সম্বন্ধে নানা কথা হইল। রাজবাটীর শুদ্ধান্তপুরটা অনেকাংশে সেকালের ধরণের, রৌদ্র এবং বায়ু চলাচলের যথেষ্ট ব্যবস্থা-

বিহীন, বাবুর বাটীর (মহারাণী-মাতার পিত্রালয়ের) ভিতর এবং বাহিরের সংস্থান বেশ স্বাস্থ্যকর। সে জন্য চিকিৎসকদের পরামর্শে কিছু দিন তাঁহার সেখানে থাকার কথা হইতেছিল। আমি বাড়ীটিতে মুক্ত বায়ু চলাচলের সুব্যবস্থার প্রশংসা করিয়া সেই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করার একান্ত প্রয়োজনীয়তা উপস্থিত সকলের হৃদয়ঙ্গম করাইলাম।

আমার জেদে পর্দ্দা ত প্রস্তুত হইল, কিন্তু তাহা জানালায় দিবার ব্যবস্থা আর হইয়া উঠে না। মার সমক্ষে ত্রৈলোক্যকে বলিলাম, দেখিও যেন আজ আঁাটিয়া দেওয়া হয়। মহারাণী হাসিলেন, বলিলেন,—"আর দরকার কি ? শীতকাল আসিল, এখন দুয়ার বন্ধ করিতে হবে।" ২।৪ দিনেই এই উপেক্ষার ফল বুঝা গেল। আমার প্রশ্নোত্তরে মাতা স্বীকার করিলেন যে তাঁহার দক্ষিণ কর্ণের শ্রবণ-শক্তি যেন কিছু কমিয়াছে। এবং তিনি বুঝিতে পারিতেছেন কাণ পাকিয়াছে। আশঙ্কা প্রকাশ করিলাম যে অবিলম্বে চিকিৎসা না হইলে কর্ণের স্থায়ী পীড়া

হইতে পারে। স্থির হইল ডাক্তার চন্দ্রবাবুকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়া যথাবিহিত করা যাইবে।

আমার সঙ্গে ডাক্তারবাবুর কথাবার্ত্তার পরদিন তিনি আসিলেন। ডাক্তার অন্দরে প্রবেশ করিয়া বড় হলের নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র গৃহদ্বারের এক পাঠ বন্ধ হইল, উন্মুক্ত দ্বারে অন্নদাসী বসিল। তখন চন্দ্রবাবু মহারাণী-মাতার কাণের অসুখ সম্বন্ধে একে একে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমায় সুধাইলেন —মা গরম জল ও সাবানের পিচকারী কর্ণে প্রয়োগ করিতে দিবেন কি না? আর নারিকেল তৈলে আতর মিশ্রিত করিয়া কাণে দিতে আপত্তি আছে কি না? আমি তাঁহাকে সম্মত করাইলাম। কিন্তু পিচকারী প্রয়োগ ত ডাক্তারের দ্বারা হইবে না। দাসীরাও তাহাতে সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত। শেষ সে ভার আমার উপর পড়িল।

ঔষধ আনিবার জন্য আমি ডাক্তার বাবুর সঙ্গে বহির্ব্বাটীতে গেলাম। পুটিয়াতে রাজা পরেশ নারায়ণের দাতব্য ঔষধালয় ছিল, এখনও আছে;

মহারাণী মাতার প্রতিষ্ঠিত ঔষধালয় সকল মফঃস্বলে —ভাল ঔষধের দোকান সেখানে আমরা দেখিয়া আসি নাই। ইদানীং সেজন্য একটী ঔষধালয় রাজবাটীতেই খোলা হইয়াছিল। রাজপরিবার-বর্গ ও ভৃত্যদের নিমিত্ত আদৌ তাহা স্থাপিত হইলেও বাহিরের অনেক লোক সেখানে ঔষধ লইতে আসিত, বিশেষ তখন অসুখের সময়, আর পুটিয়ার স্বাস্থ্য কোনকালে ভাল নয়। স্বর্গীয় রাজার আমলে ত্রিতলের যে গৃহ সচরাচর তাঁহার বৈঠক-রূপে ব্যবহৃত হইত, দেখিলাম ঔষধ সেইখানে রক্ষিত হইয়াছে। ঐ ঘরগুলি ইহার আগে বন্ধই থাকিত, আমি আর কখন তাহাতে প্রবেশ করি নাই। দেখিলাম তাহাদের জীর্ণাবস্থা; সেখানকার আসবাবগুলিও পুরাতন এবং অযত্নরক্ষিত। ঔষধ লইয়া আমি পুনরায় অন্তঃপুরে মার কাছে গেলে তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন—কাল সন্ধ্যার পর বাহিরে তুমি চন্দ্রাবলীকে জানালার পর্দ্দার কথা আর আমার কাণের অসুখের কথা সুধাইয়াছিলে। সে

আসিয়া বলিল, "শ্রীশ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন কাণে পর্দ্দা দেওয়া হইয়াছে কি না ?" উপস্থিত সকলেই হাসিয়া উঠিল। আমি অতি সাবধানে মাতার কর্ণে পিচকারী প্রয়োগ করিয়া ঔষধ দেওয়াইলাম। ২।৪দিন ঐরূপ করায় কিছু উপকার হইল। কিন্তু মাঝে মাঝে ইহাতে ব্যাঘাত ঘটিতে লাগিল। কোন কোন দিন দাসীদের ভুলে সময়মত গরম জল প্রভৃতি প্রস্তুত থাকে না, মাতাও তাহাতে কাহাকেও কিছু বলেন না। এরূপ যে দিন ঘটিত, আমি বারম্বার তাঁহাকে কাণে শুষ্ক সেঁক দিতে অনুরোধ করিয়া বাসায় ফিরিতাম। কুমারের পশ্চিমযাত্রার পূর্ব্বে তাঁহার সঙ্গোপনে উইল করার গোলমালেও কয়দিন উপর্য্যুপরি কর্ণের চিকিৎসা বন্ধ রহিল। যাহা হউক অসুখটা ক্রমে সারিয়া গেল।

তাঁহার মানসিক ক্লেশের কথা বলিতেছিলাম। ইতিপূর্ব্বে সে পরিচয় কিছু কিছু দিয়াছি। সকল বাধা বিপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া কুমার অযোধ্যাগমন-স্থির নিশ্চয় করিলেন। যাওয়ার আগে মহারাণীর

অজ্ঞাতসারে অতি গোপনে এক উইল করিয়া দস্তুর মত লোহার সিন্ধুকে রক্ষা করিবার জন্য কলেক্টর সাহেবকে উহা অর্পণ করিতে বোয়ালিয়ায় গেলেন। এখানে বলা উচিত যে তাঁহার দেহত্যাগের পর দেখা গিয়াছিল সে উইল খানিতে মাতার অনিষ্টকর কিছু ছিল না। কিন্তু তখন মন্ত্রগুপ্তির কাজটা মাত্রা ছাড়াইয়া সম্পন্ন হওয়ায় ভারি দুঃখের বিষয় হইয়া উঠিল। কুমার মাতৃদেবীকে খসড়াটা দেখাইয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করিলে জল্পনা কল্পনার কোন কারণ ঘটিত না—কোনরূপ মনোমালিন্যের অবসর উপস্থিত হইতে পারিত না। মাতার বেশী কষ্টের কথা এই হইল যে কুমার তাঁহাকে ছাটিয়া ফেলিয়া অন্যান্যের পরামর্শ-মত চলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। যাহা হউক সে কার্য্য শেষ করিয়া কুমার একদিন রাত্রি ১১টার সময় জেলার সদর হইতে ফিরিয়া আসিলেন এবং দুই ঘণ্টার ভিতর মহারাণীর কাছে বিদায় লইতে গেলেন। মা কেবল অশ্রুত্যাগ করিতে-ছিলেন। কুমার বলিলেন, "এখন ত চলিলাম,

ভাল করিয়া বিদায় দিন্।” মা উত্তর করিলেন, “ভাল করিয়া আর কি বলিব? যাহা তোমার ইচ্ছা হইতেছে, তাহাই ত করিতেছ! তাহাই কর।”

তার পর রাত্রি ১টার আমলে কুমার পশ্চিম চলিয়া গেলেন। ইহাতে মহারাণী মাতার কয়টা দিন বড় মনঃকষ্টে কাটিল। এই সময়ে রাজসংসারের পেন্‌সেনপ্রাপ্ত আত্মীয় জগৎপ্রচণ্ড মহাশয় কাশী হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি তখন এমন বৃদ্ধ হইয়াছিলেন যে ভাল করিয়া দেখিতে শুনিতে পান না। মানসিক ক্লেশে মার শরীর আবার খারাপ হইল। সকল শুনিয়া তিনি তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন এবং হাত দেখিলেন। অন্যান্য কথা আরম্ভ হইলে চক্ষের জলে মাতার গণ্ডপ্লাবিত হইল, প্রচণ্ড মহাশয়কে বলাইলেন তিনি কদাপি আর এখানে (পুটিয়ায়) থাকিবেন না। বৃদ্ধ মর্ম্মপীড়িত হইয়া বলিলেন,—“থাকা আর অবৈধ। মা সতীলক্ষ্মী, যাহারা তাঁহাকে কাঁদায়, তাহাদের কি ভাল হইবে?”

যে মুষ্টিমেয় পুরাতন এবং বিশ্বাসী কর্ম্মচারী পুটিয়া রাজসংসারের স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন, আনন্দ-মোহন ওরফে বানু সরকার মহাশয় তাঁহাদের অন্যতম। সম্প্রতি ন্যূনাধিক সত্তর বৎসর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন।

সচরাচর অপ্রিয় সত্যবাদী এবং কৃষ্ণকায় বানু সরকার যতটা বাহিক সম্ভ্রম ও ভীতির সঞ্চার করিতেন, তাহাতে তাঁহার অন্তর্নিহিত কমনীয় গুণরাজি বাহিরের লোকের কাছে প্রকাশ পাইত না। তিনিও আপনা হইতে তাহার পরিচয় দিতে কখন ব্যস্ত ছিলেন না। বরং সাধারণে তাঁহাকে ঠিক্ উল্‌টা বুঝিলে তিনি যেন একটা আনন্দ অনুভব করিতেন। স্বর্গীয় পিতৃদেব মহাশয় ১২৭৮ সালে যখন দ্বিতীয়বার রাজ-সংসারের দেওয়ান হন, আমাদের সেই কিশোর কালে সর্ব্বপ্রথমে সরকার মহাশয়ের সহিত পরিচয় হয় এবং আমরা পিতার সহিত পূর্ব্ব ঘনিষ্ঠতার দরুণ তখন হইতে চিরদিন তাঁহাকে পিতৃব্যবৎ মান্য করিয়া

আসিয়াছি। তখন পাঁচ-আনির নূতন ও চৌকীর দক্ষিণদিকে দেওয়ানজীর জন্য নূতন বাসগৃহ নির্ম্মিত হইতেছিল। সরকার মহাশয়ের বাড়ীতে কয়মাসের জন্য আমাদের বাসা নির্দ্দিষ্ট হইল। এই সূত্রে ভ্রাতৃগণসহ আমি তাঁহার শুদ্ধান্তঃপুরে ঘরের ছেলের মত পরিচিত হইয়াছিলাম এবং তদীয় সহধর্ম্মিণী ও বিধবা ভগিনীর যে অপত্যবৎ স্নেহ তখন হইতে লাভ করিয়াছিলাম, কখন তাহার লাঘব হয় নাই। ফলত তাঁহার পারিবারিক জীবন বড় মধুর এবং শান্তিময় ছিল এবং সেই সিংহরাশি পুরুষ কি কঠোরে কোমল হৃদয় লইয়া জন্মিয়াছিলেন, লক্ষ্মীরূপা গৃহিণী এবং গৌতমীসদৃশা ভগিনী অধিষ্ঠিত আম্র-নারিকেলছায়াচ্ছন্ন তাঁহার সেই আশ্রমতুল্য গৃহে তাঁহাকে না দেখিলে তাহা ঠিক বুঝা যাইত না।

তিনি জাতিতে তৌলিক ছিলেন এবং সেই জাতির মুকুটস্বরূপ দীঘাপতিয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা দয়ারাম-সুলভ মন্ত্রণাকুশলতা তাঁহাতে পরিলক্ষিত হইত। গল্প আছে প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী

ভবানী ও তাঁহার স্বামীর নাবালকী অবস্থায় দয়ারাম কয়টী জায়গীর দান করেন। রাণী পরে কর্ম্মচারীর অধিকার বহির্ভূত বলিয়া বাজেয়াপ্ত করিতে উদ্যত হইলে দয়ারাম বলিলেন, মা তা হলে তোমার অস্তিত্ব থাকে না, কেননা আমিই তোমাদের বিবাহ দেওয়াইয়াছি। এইরূপ নির্ভীক স্পষ্টবাদিতা বান্নু সরকার মহাশয়েরও চরিত্রের অস্থিমজ্জা ছিল এবং তাঁহার সম্বন্ধে সময়ে সময়ে যে অদ্ভুত জনরব উঠিত তাহার মূলও ইহাই। মহারাণী-মাতার নিজ মুখে একবার শুনিয়াছিলাম, চারি-আনির রাণী গল্পচ্ছলে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে বান্নু সরকারের পায়ের কাছে একবার একটা বেল গাছ হইতে পড়িয়াছিল। সরকারজী তাহাতে হাসিয়া মন্তব্য প্রকাশ করেন—"দেখ শিবের চেয়ে মাহাত্ম্য আমার বেশী! শিব বিল্বপত্র মাথায় ধরেন, বেল আমার পায়ে পড়িল!"

পুটিয়ার ন্যায় ব্রাহ্মণপ্রধান ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব সমাজে নবশাখসম্প্রদায়ের কোনরূপ প্রাধান্য যে সেকালে অসহনীয় ছিল তাহা বলা বাহুল্য। প্রধানত আমার

উদ্যোগে একবার ব্রাহ্মপ্রচারক একজন রাজবাটীতে উপাসনা এবং সঙ্গীত করিয়াছিলেন। অপরাধের মধ্যে তিনি তাঁহার বক্তৃতার মাঝে মাঝে ভগবদ্‌গীতা এবং উপনিষদ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। এজন্য সমাজের তিলক-পুণ্ড্রকধারীদের কাছে ভৎর্সিত হইতে হইয়াছিল—"ছি বাবা, শূদ্রে গীতার ব্যাখ্যা করে, তাই কি শোনা লাগে?" এই শ্রেণীর লোক বান্নু সরকার মহাশয়ের দ্বেষক ছিলেন। ভণ্ডামির জন্য মাঝে মাঝে তাঁহারা তাঁহার কাছে স্পষ্ট দুকথা শুনিয়া জ্বলিয়া যাইতেন। শ্রদ্ধেয় ডাক্তার সরকার যেমন জাতির কথায় গৌরব করিয়া বলিতেন, "চাষ এখনও ছাড়ি নাই, বিজ্ঞানের চাষ চলিতেছে," ইনিও তেমনি সে পরিচয়ে তদ্রূপ আনন্দানুভব করিতেন। কুমারের প্রথম দেশ-ভ্রমণ জন্য লুকাইয়া পলায়নের বিবরণ ইতিপূর্ব্বে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। সেই উপলক্ষে বান্নু সরকার মহাশয়ও কলিকাতায় গিয়াছিলেন। সেখানে এক অধ্যাপক

ব্রাহ্মণের নিকট তাঁহাকে পরিচিত করার সময় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধিধারী তাঁহার এক সুহৃদ কিছু সঙ্কোচ বোধ করিয়া বলিয়াছিলেন, "মহারাণী স্বর্ণময়ী যে জাতীয়, বাবু কৃষ্ণদাস পাল যে জাতীয়, ইনিও সেই জাতীয়।" বন্ধুকে সেরূপ বিপদগ্রস্ত দেখিয়া সরকারজী স্মিতমুখে এবং ধীর প্রশান্তভাবে বলিলেন—মহাশয় আমরা তিলি!

সরকার মহাশয় 'সুশিক্ষিত' দলভুক্ত ছিলেন না, জমীদারী সেরেস্তার বাঙ্গালায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন মাত্র। কিন্তু পাণ্ডিত্যের বড় সমাদর করিতেন। চরিত্রবান্ শিক্ষানুরাগী যুবকদের সর্ব্বপ্রকার সহায়তা করা তাঁহার একটা অবশ্য কর্ত্তব্যকার্য্যের মধ্যে ছিল। তিনি ছোট ছেলেদের লইয়া আমোদ-প্রমোদ করিতে বড় ভাল বাসিতেন—এবং তাহাদের ভিতর কাহারও রচনাশক্তির পরিচয় পাইলে তাহাকে উৎসাহিত করিতেন। শৈলেশচন্দ্রের বয়স যখন চোদ্দ বৎসর মাত্র, তখন একদিন সরকার মহাশয়ের ফরমাইস হইল, রাজঘোড়ীর একটা বর্ণনা লেখ

শৈলেশের সেই রচনার প্রথম দিকের দুই একটা লাইন মনে পড়িতেছে:—

মস্তকে ধরেছ তুমি বাম্ন,

আর তুমি ধরিয়াছ বানু নীলমণি,—

ছাড়িও না কভু তারে।

তখন বালকের কবিতার এই বানু নীলমণিতে ভারী হাসি পড়িয়া গিয়াছিল। এখন মনে হয় সরকার মহাশয় অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া রাজসংসারের কি বল-ভরসা ছিলেন; তাঁহার স্থান বাস্তবিক পূর্ণ হইবার নহে।

সাধক রামপ্রসাদ ভগবতী আদ্যাশক্তির মাতৃ-স্নেহ ধ্রুব নিশ্চয় জানিয়া যেরূপ নিঃসঙ্কোচে আদুরে ছেলের মত বাৎসল্যের অভিনয় করিতেন, মহারাণী-মাতার প্রতি সরকার মহাশয়ের সেই ভাব ছিল। মাতা ইহা বেশ জানিতেন এবং তাঁহার সেই দুরন্ত দুর্ম্মুখ ছেলেটার উপর মাঝে মাঝে খুব রাগ করিলেও শেষে সব ভুলিয়া যাইতেন।

কুমারের বিবাহের পর রাজসংসারের ব্যয়-

সঙ্কোচ আরম্ভ হইল, — নহিলে দেনা বাড়িয়া যায়।
কিন্তু মহারাণীমাতার হাত অত্যন্ত দরাজ—দানাদির
ব্যাপারে খরচ কমাইতে কিছুতে তিনি সম্মত হন না,
বানু সরকার ধনাধ্যক্ষ, টাকাকড়ি সব তাঁর হাতে,
মনিব আদেশ দিলেও দানের পূরা টাকা এবং
পূর্ব্বের মত সত্বর, আর খাজাঞ্চিখানার বাহির হয়
না। ক্রমে ইহা মহারাণী-মাতার গোচর হইল,
তিনি বড় বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। হাজার অসন্তুষ্ট
হইলেও মাতা কাহাকেও কটু কথা বলিতেন না,
কিন্তু বানু সরকার এই নিয়মের ব্যতিক্রমস্থল
ছিলেন। একদিন ত্রৈলোক্যকে বলিতেছিলেন,
"তিলির পায়ে ধরা অপেক্ষা গোবিন্দ মজুমদার
ব্রাহ্মণ, তার পায় ধরিও, কাজ হইবে। * * *"
আর এক সময় সরকারজীর কথায় বলিয়াছিলেন,
—"দেখ ক্ষমতা একদিন সবাই পায়, কিন্তু ক্ষমতা
স্থায়ী নয়। জানি, রামজয় মজুমদার একদিন বড়
ক্ষমতা দেখাইয়াছিলেন!"

মহারাণীর স্বসম্পর্কীয় রোহিণী সান্যাল বানু

সরকারের অধীনে কাজ করিতেন এবং তাঁহাকে জ্যাঠা বলিয়া ডাকিতেন। এক ঠাকুরাণী একদিন সান্যাল মহাশয়ের সমক্ষে বলিলেন, রোহিণীর চেহারা বাসু সরকারের মত হইতেছে। মা কহিলেন—"চেহারা ত জ্যাঠার মত হইতেছে, স্বভাবও বা হয়!" পরে সরকারজীর কথা উঠিল। তাঁহাকে কেয়ার করে না, তিনি টাকা চাহিতে পাঠাইলে তহবিলে টাকা থাকিলেও দেয় না, বরং তুচ্ছ করে। বৃন্দাবন দত্ত বলিল—"মা তাহা কি হইতে পারে?" মাতা বলিলেন—"কাল পনর টাকা চাহিতে পাঠাইয়া পনর ঝাঁটা পাইয়াছি।" কথা প্রসঙ্গে আর একদিন বলিতেছিলেন,—"কিছুতে দস্তখৎ করে না, এদিকে সাড়ে ষোল আনার কর্ত্তা!"

২৩

মহারাণীর পোষ্য-পুত্র কুমার যতীন্দ্রনারায়ণের উপর বাসু সরকার মহাশয়ের অসাধারণ প্রভাব ছিল। কুমার তাঁহার বয়ঃপ্রাপ্তির পূর্ব্ব হইতে ভাল মন্দ যাহা কিছু করিতেন, লোকে সুতরাং তাহা

নির্বিচারে সরকারজীর নামের সহিত সংযুক্ত করিত। অধিক কি স্বয়ং মহারাণী-মাতাও শেষের দিকে তাহাই বিশ্বাস করিতেন এবং মাঝে মাঝে কোনও গুরুতর কাজের কথা উপস্থিত হইলে কুমারকে ব্যঙ্গ করিয়া স্মিতমুখে বলিতেন—"তোমার বাক্স সরকার কি বলে ?"

সরকার মহাশয় যে রাজদরবারসুলভ কৈতব-বাদে অভ্যস্ত ছিলেন না তাহার কিছু কিছু পরিচয় ইহার পূর্ব্বে দিয়াছি। যতীন্দ্রনারায়ণ অন্যের কাছে "হুজুর, ধর্ম্মাবতার, কুমার মহাশয়" হইলেও সরকারজীর কাছে বরাবর "তুমি" ছিলেন এবং যৌবন সীমায় পদার্পণ করার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত লেখা-পড়ায় অমনোযোগ জন্য যখন তখন তাঁহার কাছে ধমক খাইতেন। ইহার পর অবশ্য সে দিন আর রহিল না। উকীল মহেন্দ্রনাথ সান্ন্যালের সঙ্গে এক দিনকার ঘটনায় তাহা বুঝা যাইবে। সান্যাল মহাশয় বি, এ পাস করিয়া পুটিয়া স্কুলের যখন প্রধান শিক্ষক হইয়া আসিয়াছিলেন, কুমার তখন সেখানকার

নিম্নশ্রেণীর ছাত্র। তারপর কয় বৎসরের ভিতর মহেন্দ্রবাবু আইন পাস করিয়া রাজসাহীতে ওকালতী করিতে গেলেন এবং পাঁচ-আনির রাজবাটীর বেতনভোগী উকীল হইলেন। বছর দুই তিন পরে একদিন কার্য্যোপলক্ষে তিনি পুটিয়ায় আসিলেন এবং মহারাণীর নিকট এত্তালা পাঠাইয়া উপরের বৈঠকখানায় আদেশের অপেক্ষা করিতে-ছিলেন। এমন সময় কুমার সেখানে আসিলেন এবং ভূতপূর্ব্ব হেড্ মাষ্টারবাবুকে অভ্যাস মত জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন আছেন? সান্যাল মহাশয় আত্মবিস্মৃত হইয়া বলিয়া বসিলেন—"এ সব যাইতে দাও, পড়া শুনা কি করিতেছ তাই বল।" কুমার বিরক্ত হইয়া উত্তর করিলেন—"আপনি কি আমার পরীক্ষা লইতে আসিয়াছেন?" মহেন্দ্র-বাবু নিজের মান নিজের কাছে ভাবিয়া গম্ভীর হইয়া বসিলেন এবং স্বয়ং কখন কাহারও কাছে এ গল্প করেন নাই। কিন্তু কুমার মহাশয়ের সঙ্গীদের মুখে মুখে কথাটা রাষ্ট্র হইয়া গেল।

সুশিক্ষিত না হইলেও সরকারজীর ভাল জ্ঞান ছিল, এরূপ ভুল তাঁর বড় হইত না। শাস্ত্রবচন স্মরণ করিয়া তিনি কুমারকে অতঃপর নিজের প্রভাব অনুভব করিতে দিতেন না এবং মিত্রবৎ আচরণ করিয়া তাঁহার দোষসংশোধনের চেষ্টা করিতেন। একদিনের কথা বলি। কুমার একটা ব্যাঘ্রশিশু পুষিয়াছিলেন। ক্রমে সে বড় হইয়া লোকভীতির কারণ হইল—কেননা কুমার বাহাদুর তাহাকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিতে দিতেন না। এদিকে তাহার ছোট খাট জীবহত্যা চলিতে লাগিল, একদিন একটা ভেড়া মারিয়া ফেলিল। কুমারকে সাহস করিয়া কে সে অত্যাচারের কথা জানায়? মহা-রাণী-মাতার গোচর করিতে কাহারও সাহস হয় না। বানু সরকার কুমারের জ্বর শুনিয়া তাঁহাকে দেখিতে গেলেন এবং কথায় কথায় সেদিন ব্যাঘ্র-শাবকের দৌরাত্ম্যের গল্প করিয়া রহস্যের স্বরে বলিলেন—"সেই সময় বরকন্দাজদের প্রতি আক্রমণের উদ্যোগ করাতে তাহারা বাঘকে মারিয়াছে।" কুমার সরকার

মহাশয়ের ইঙ্গিতটুকু বুঝিয়া বিরক্ত হইলেন। বলা বাহুল্য বাঘ মারিয়াছে এ কথা বিশ্বাস করিলেন না। একটু পরে সরকারজীর সঙ্গে আমরা কৌতূহলী হইয়া ব্যাঘ্রশাবক দেখিতে গেলাম। ইহার মধ্যেই সে ভয়ানক হইয়াছিল। সেই সদ্যোহত মেষটাকে সম্মুখে রাখিয়া বসিয়া আছে,—জনতা দেখিয়া মহা বিরক্ত হইয়া উঠিল এবং বিড়াল শিশুর মত ফোঁস ফোঁস করিতে লাগিল। তার পর কয়বার লাঠির খোঁচা খাইয়া প্রাপ্তযৌবন শার্দ্দূলবৎ গর্জ্জন করিয়া উঠিল। এমন সময় তাহার রক্ষক ও আহারদাতা রামসুন্দর খানসামা আসিল। বড় উত্যক্ত হইলেও বাঘটা তাহার পায়ে লুটাইয়া পড়িল এবং নানারূপে কৃতজ্ঞতা জানাইল।

কুমারের বিবাহের পর তাঁহার শ্বশুর মহাশয় কিছু দিন মধ্যে ষ্টেটের নূতন বন্দোবস্ত করাইবার জন্য জামাতাকে পরামর্শ দিতে লাগিলেন। মহারাণী নিজে কুমারের হাতে সব ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, বৈবাহিকের ক্ষমতা প্রতিপত্তি লাভের চেষ্টা সন্দেহের

চক্ষে দেখিবার প্রবৃত্তি স্বতঃই তাঁহার ছিল না। কিন্তু সরকারজী কর্তব্যবোধে নিজের হিতাহিত তুচ্ছ করিয়া ইহার বিপক্ষে দাঁড়াইলেন। প্রথম প্রথম চক্ষুলজ্জায় পড়িয়া কুমার শ্বশুরের কথাবার্তা শুনিতেছিলেন; কিন্তু সরকারজীর প্রতিবাদে তাহার অবৈধতা বুঝিতে পারিলেন। তখন রায় মহাশয়ের সহিত বাস্তু সরকারের অহি-নকুলসম্বন্ধ দাঁড়াইল। পুটিয়ার রাজ-সংসারের শেষদিকটার কাহিনী ন্যূনাধিক পরিমাণে সেই দ্বন্দেরই ইতিহাস মাত্র।

এই সময় বাস্তু সরকার মহাশয়কে বিলক্ষণ বেগ পাইতে হইয়াছিল। এবং তিনি যেরূপ নিষ্ঠা ও দৃঢ়চিত্ততার সহিত রাজসংসারের কল্যাণ-কামনায় সকল প্রকার স্বার্থের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে বাধ্য হইয়াছিলেন তাহা উচ্চশ্রেণীর রাজমন্ত্রীর উপযুক্ত। নূতন ম্যানেজার দক্ষ ও সুশিক্ষিত ব্যক্তি হইলেও সকল বিষয়ে সরকার মহাশয়ের মত গ্রহণ করিয়া কাজ করিতেছেন, ইহা সাধারণে বুঝিতে পারিল। রায় মহাশয় সদলবলে এবং সরকারজীর অন্যান্য শত্রুরা

ইহাতে খড়্গহস্ত হইয়া উঠিলেন। মহারাণীমাতা এই কর্ম্মচারীর অদম্য ব্যয়-সঙ্কোচের চেষ্টায় মহা-বিরক্ত হইয়াছেন বুঝিতে পারিয়া নিন্দুকেরা সুবিধা পাইল। বিশেষত দুই একটা বিষয়ে সরকার মহাশয় মাতার পরিণামে শুভোদ্দেশেই বোধ হয় তাঁহার মানসিক ক্লেশের কারণ হইয়াছিলেন। একদিন আমায় বলিলেন—“দেখ, বানুকে আগে বড় বিশ্বাস করিতাম, কিন্তু সেবার * * হইতে বিশ্বাস একেবারে গিয়াছে। রাজ-সংসারের হিতকারী হইতে পারে, কিন্তু আমার অহিতকারী। খালিসার সেলামী তহবিল যে আমার হাত হইতে লওয়া হইল, উহার পরামর্শ ব্যতীত তাহা হইতে পারিত না। * *”

মাতার এইরূপ বিরূপতা বুঝিতে পারিয়া সরকারজীর প্রতি অসূয়াপরবশ লোকেরা তাঁহার সমক্ষেই বিদ্রূপ করিত। বৃন্দাবন দত্ত মহারাণী মাতার পিতার আমলের কর্ম্মচারী এবং তাঁহাকে কোলে পিঠে করিয়াছিল। একদিন আমরা মার কাছে বসিয়া আছি, এমন সময় এই ব্যক্তি আসিয়া

কি কথায় বলিল,—"ইহার মধ্যে কলেক্টর সাহেব আছেন।" আমি কিছু বুঝিতে না পারিয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি হাসিয়া বলিলেন—"উহারা বানু সরকারের ঐ নাম রাখিয়াছে।" ইহাতে উপস্থিত কেহ বলিল যে কলেক্টর সাহেবের যে সাদা মুখ। দত্তজা বলিল—"মা সুধাইয়াছিলেন—ম্যানেজারের উপর কে?—ম্যানেজারের উপর কলেক্টর!" ম্যানেজার বানু সরকারজীর সব কথা শোনেন, ইহাতেই এই রূপকের কল্পনা!

পুটিয়া ইংরেজী বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা একটা দরওয়ানের ঔদ্ধত্যে বিরক্ত হইয়া তাহাকে প্রহার করিয়াছিল। হেড্‌মাষ্টার বাবু দরওয়ানের পক্ষাবলম্বন করেন। কমিটীতে ছেলেদের বিচার হইল। পরদিন আমি মহারাণীমাতাকে প্রণাম করিতে গিয়া তাঁহার কাছে বসিয়া আছি এমন সময় কুমার আসিলেন। কথায় কথায় আমায় স্কুল-কমিটীর বিচারের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। কুমার ছেলেদের দিকে, কমিটীর বিচার তাহাদের বিরুদ্ধে হইয়াছিল

—ইহাতে তিনি সন্তুষ্ট হন নাই। বলিলেন—“সরকারজী জয়কেতে, শুনিলাম বলিয়াছিল হেড্-মাষ্টার বাবুর মতেই আমার মত। কেবল দেওয়ানজী আসল কথা বলিয়াছিলেন।” বানু সরকার স্কুলের মেম্বর শুনিয়া মহারাণী মাতা হাসিলেন, বলিলেন “সে মেম্বর হইয়া কি করে ?” কুমার চলিয়া গেলে মা বলিলেন—“কাল কোকা ও বানু সরকারের সঙ্গে আমার কাশী যাওয়ার কথা হইয়াছিল। বানু বলিল যে আপনি কাশীতে থাকিলে অনেক খরচ করিবেন। আমি বলিলাম, না, আমায় যে দিব্য করিতে বল, করিতেছি। তথাপি বলিল, বিশ্বাস নাই। নিজের স্বভাব দিয়া অন্যকে দেখে। নিজে যেমন অবিশ্বাসী !” এই সময় মাতা সম্বাদপত্র পড়িতেছিলেন, তাহাতে পুরীর রাজার দীপান্তর-বাসের বিবরণ ছিল। আমায় বলিলেন, পড়িয়া দেখিও।

বানু সরকার মহাশয়ের মাসতুতো ভাই কৃষ্ণানন্দ মহারাণীমাতার জায়গীর-সেরেস্তায় কাজ করিতেন, এই সময় তাঁহার দ্বারা বিস্তর তহবিল তছরূপাতের

কথা জানা গেল। মা তখন বানু সরকারের উপর বড় বিরক্ত—একদিন গোবিন্দ মজুমদার দেখা করিতে আসিলে আমার সমক্ষে তাঁহাকে বলাইলেন—"কেমন দেখিলেন ত চোরে চোরে মাসতুতো ভাই!" মজুমদার মহাশয় হাসিলেন, বলিলেন "না, বানু আর চোর নয়!" মা তাহা বিলক্ষণ জানিতেন, তথাপি রহস্য করিবার জন্য পুনরায় বলাইলেন—"শুনিয়াছিলেন, দেখিলেন!"

অযোধ্যা-প্রদেশে যাওয়ার আগে কুমার মহারাণীকে লুকাইয়া যে উইল করেন, তাহাতেই বানু সরকার অত্যন্ত বিরাগভাজন হইয়াছিলেন, অন্য কেহ কুমারকে ইহাতে প্রবৃত্ত করাইতে পারিত না। কুমার যাত্রার আগে দেখা করিতে আসিলে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে বলিলেন—"এ সংসারে কেবল বানু সরকারকেই চিনিয়াছিলে! কিন্তু শকুনি যেমন কুরুকুল নষ্ট করিয়াছিল, বানু সরকার তেমনি রাজ-সংসার মাটি করিল। * * *"

ইহার পর আবার কাশী গমনের প্রস্তাব উঠিল।

কয়দিন ধরিয়া ইহার আলোচনা চলিলে পর আমি মহারাণীমাতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"মা, কাশী যাওয়াই কি স্থির হইল ?" * * তিনি বলিলেন—"তাহাই স্থির। সেদিন ম্যানেজারের সঙ্গে সেই কথা হইতেছিল। তিনি বলিলেন, সেখানে আপনি থাকিতে পারিবেন না, অনেক ব্যয় পড়িবে! মন্মোহন সান্যালকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছি জায়গীরের সকল টাকাই খরচ হইতেছে কিছুই বাঁচিতেছে না। এ অবস্থায় কাশী গিয়া চলিবে কিরূপে ? আমি উত্তর করিলাম, মানুষের সকল দিন সমান যায় না। এখন টাকা আছে সেইরূপ খরচ করিতেছি! পরে যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইবে, তেম্‌নি খরচ করিব। শ্রীনাথ ভাদুড়ীর কাছে জানিয়াছি, মাসে হাজার টাকা হইলেই হইবে।" মা বলিতে লাগিলেন—"অমনি বানু সরকার বলিয়া উঠিল, তাহা হইলে আপনাকে শ্রীনাথ ভাদুড়ীর অধীনে থাকিতে হইবে, কিম্বা আজ কাশী হলো না, কাল বৃন্দাবন, এইরূপ করিতে হবে। তাচ্ছিল্যের

স্বরে এই সব কথা বলিল। আমার কষ্টবোধ হইল, ভাল করিয়া শুনিলাম না। সেদিন ত্রৈলোক্যকে দিয়া বানুকে বলাইয়াছিলাম যে, প্রথমে তুমি কি ছিলে? কারখানার মুহুরী! তার পর কি হও? কারখানার দারোগা! তার পর আজ কি হইয়াছ? কে এ সব করিয়া দিল? বানু সরকার বলিয়াছে আমি বলিলে এ সব হইতে ক্ষান্ত হইতে পারে। *"

উইল করিয়া কুমার পশ্চিমে চলিয়া গেলে নানা-লোকে মহারাণীমাতাকে নানারূপ পরামর্শ দিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই সম্বন্ধে মন্ত্রগুপ্তিটা বেশী মাত্রায় রক্ষিত হওয়ায় মাতার মন সন্দেহান্দোলিত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি ২।১ জন বিজ্ঞ লোকের সঙ্গে এ বিষয়ে যুক্তি পরামর্শও না করিয়াছিলেন এমন নহে। কিন্তু সরকার মহাশয় ইহা পচ্ছন্দ করিতেছিলেন না। মার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়া এত্তালা করিলেন যে, আজ তাঁর শরীর অসুস্থ, কয়টা কথা বলিতে চান। কথাগুলো একটু মোটা হইবে। মহারাণী উত্তর করেন, মোটা কথা তিনি শুনিতে চান না।

তার পর সরকারজী বলিলেন, তিনি শুনিতেছেন যে নির্ব্বোধ লোকেরা তাঁহাকে পরামর্শ দিতেছে; তাহারা সাক্ষাতে বলিলে ভাল হয়, বানু সরকার সকলের সঙ্গে তর্ক করিতে প্রস্তুত আছে। তর্কে পরাস্ত হইলে সে একশত জুতা খাইতে রাজি! মহারাণী উত্তরে বলিলেন—"সংসারে যত বুদ্ধিমান বানু সরকার!" শেষে সরকারজী কহিলেন, "যদি কিছু অন্যায় হইয়া থাকে বুঝেন, আমাদিগকে বলিলেই হয়।" মহারাণী—"তার প্রয়োজন কি? যদি কিছু করিয়া থাক, মনে করিয়া দেখ।"

২৪

এই ক্ষুদ্র লেখকের প্রতি মহারাণীমাতার অপত্য-নির্ব্বিশেষ স্নেহ এবং বিশ্বাস ছিল বলিয়া তাঁহার হিতকামনায় সময়ে সময়ে পুটিয়া দরবারের রাজ-নীতিতে যোগদান আমার পক্ষে অনিবার্য্য হইয়া উঠিত। জীবনের সেই পূর্ব্বাহ্নে সচরাচর আমি সাহিত্যালোচনা এবং স্বদেশের এক আধটু কাজ লইয়া থাকিতাম—জমীদারীর চাণক্যনীতিকে পদ্মার

আবর্ত্ততুল্য দূর হইতে পরিহার করাই শ্রেয়স্কর মনে করিতাম। কিন্তু কুমার মহাশয়ের বিবাহের পর তাঁহার শ্বশুর-কুলের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে যে নূতন শক্তি প্রাথমিক বর্ষার গৈরিক প্রবাহতুল্য রাজসংসারকে আন্দোলিত করিয়া তুলিল, তাহাতে কাহারও শান্তি ছিল না। পিতৃদেব মহাশয় পেন্‌-সন গ্রহণ করিলেন—স্বয়ং মহারাণী একে একে সমস্ত ক্ষমতা কুমারের হস্তে ছাড়িয়া দিয়া কাশীবাসের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। এ অবস্থায় যেরূপ ঘটিয়া থাকে, অধিকাংশ লোক মাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও কর্ত্তব্য ভুলিয়া নিজের নিজের পথ দেখিতে লাগিল। সুতরাং তাঁহার হিতাকাঙ্ক্ষীদের পক্ষে নীরবে দূর হইতে তরঙ্গ গণনা আর সমীচিন বোধ হইল না। এই সময়ে এক এক দিন নানা প্রতি-কূলাবস্থায় তাঁহার চিত্ত-বিক্ষোভ লক্ষ্য করিয়া আমার মনে হইত—

হিমানীর দেশে রাজে যেই বিহঙ্গিনী,
কে গ্রীষ্মে আনিয়া তারে পূরেছে পিঞ্জরে!

কুমারের শ্বশুর ভুবন রায় মহাশয় জামাতৃ-গৃহে প্রবেশ করিয়াই রাজসংসারের সংস্কার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বিবাহে অনেকগুলি টাকা ঋণ হইয়া-ছিল। তাহা শোধের জন্য মহারাণীমাতা ও তাঁহার কর্ম্মচারীবৃন্দ চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু রায় মহাশয়ের ধারণা হইয়াছিল, ঢাকা অঞ্চল হইতে নূতন ম্যানেজার কেহ না আসিলে সুশৃঙ্খলা হইবে না। কুমারকে সেই পরামর্শ তিনি দিতে লাগিলেন। দুই চারিবার শুনিয়া শুনিয়া তিনি ইহার প্রতিবাদ করিলেন এবং শ্বশুরকে স্পষ্টই বলিলেন যে, এতদিন অত বড় ষ্টেট কি করিয়া সুখ্যাতির সহিত পরি-চালিত হইয়াছে? আর রাজসাহীতে কি লোক নাই যে ঢাকার শরণাপন্ন হইতে হইবে! উত্তরটা অবশ্য ক্ষমতা-প্রিয় হিতাকাঙ্ক্ষী শ্বশুরের কটু শুনাইল। তিনি বুঝিলেন কুমার উপলক্ষ্যমাত্র, বানু সরকারই সদলে তাঁহার অভীপ্সিত সংস্কারে বাধা জন্মাইতেছে। উভয় দলে মনোমালিন্যের সেই সূত্রপাত। রায় মহাশয় কুমারকে জেদ করিয়া

ধরিলেন যে তাঁর পরামর্শ মত কাজ করিতেই হইবে। ইহার ফলে শ্বশুর জামাইয়ে উত্তরোত্তর ভারি একটা অসদ্ভাব বাড়িয়া চলিল।

এখানে বলা আবশ্যক যে ভুবন রায় মহাশয় এই প্রসঙ্গের নগণ্য লেখককে প্রথম হইতে স্নেহের চক্ষে দেখিয়াছিলেন। সেই প্রীতিসূত্রে অনেক-বার আমি বিভিন্ন দলের মধ্যে মিলন-চেষ্টা পাইয়া-ছিলাম। কিন্তু এই চিত্র আঁকিতে বসিয়া সেই সব ব্যক্তিগত বাধ্য-বাধকতাকে আমি প্রাধান্য দিতে অসমর্থ ইহা বলা বাহুল্য। যাহা প্রকৃত, জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে তাহাই বলিতে বসিয়াছি। নিজের মতামত অথবা পক্ষপাত কিম্বা বিদ্বেষভাবের স্থান এখানে নাই।

রায় মহাশয় প্রথমেই যে ভুল করিয়া বসিলেন, কুমারের জীবনকালে তাহার আর অপনোদন হইল না। ভুবনবাবু নিজে প্রবীণ হইলেও তাঁহার এক সসম্পর্কীয় যুবক অবনী ভট্টাচার্য্যের পরামর্শে চলিতেন। এই যুবা কুমার মহাশয়ের সহিত বিবাহ-

সম্বন্ধে গোড়া হইতে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন, কাজেই বিবাহের পর লোকচক্ষে তাঁহার একটা প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। গরিব ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণের ছেলে সেটা অনুভব করিয়া কিছু অহঙ্কৃত হইয়া উঠিলে এবং কিছু দিন পূর্ব্বে যাঁহাদের সহিত আলাপ করিতে পাইলে কৃতার্থ হইত, তাঁহাদের সহিত উদ্ধত ব্যবহার করিতেও আর কুণ্ঠিত হইত না। এরূপ পরামর্শদাতার মন্ত্রিত্বে রায় মহাশয়কে প্রথম হইতে লোকের অত্যন্ত বিরাগভাজন হইতে হইয়াছিল।

জামাতাকে যখন বুঝাইতে হইত যে বিষয়-আশয় ভালরূপ পরিচালিত হইতেছে না, এবং সে জন্য তাঁর নিজের সুপরিচিত কোন লোককে তিনি ঢাকা হইতে আনাইতে চান, তখন অবশ্য মহারাণীর কিছু কিছু অপ্রশংসা না করিলে ভুবনবাবুর চলে নাই। কিন্তু কুমার ইহাতে ভারি বিরক্ত হইয়া উঠিলেন এবং শ্বশুরের সহিত দেখা শুনা পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দিলেন। বেগতিক দেখিয়া রায় মহাশয়কে উপায়ান্তর দেখিতে হইল।

ইতিপূর্ব্বে অন্যান্য প্রসঙ্গে সে কথার কতক পরিচয় দিয়াছি। বামু সরকার মহাশয় এক দিন রাজসংসারের তদানীন্তন অবস্থার কথা তুলিয়া আমায় বুঝাইতেছিলেন যে পিতৃদেব মহাশয় পেন্‌সেন-গ্রহণের পর তাঁহারা যে সকল অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহাতে স্থায়ী উপকারের সম্ভাবনা। আর কুমারের শ্বশুর যে তাঁহার উপর চটিয়াছেন, তাহার একমাত্র কারণ নিজ স্বার্থের ব্যাঘাত। রায় মহাশয় এই সময়ে মাঝে মাঝে আমায় নিমন্ত্রণ করিতেন এবং মহারাণী একটু শক্ত না হইলে যে কুমারের বুঝিবার ভুলে শীঘ্র সমস্ত নষ্ট হইবে ইহার আলোচনায় আমার মতামত লইতেন। আমি বুঝিতে পারিলাম যে জামাতার কাছে ব্যর্থমনোরথ হইয়া তিনি এক্ষণে মহারাণীর সহায়তায় কার্য্যোদ্ধার করিতে ইচ্ছুক। একদিন প্রাতে আমি রাজবাটী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছি, এমন সময়ে অবনী ভট্টাচার্য্য দেখা করিতে আসিলেন এবং বলিলেন রায় মহাশয় তাঁহাকে আমার কাছে পাঠাইয়াছেন,

একবার যাইতে হইবে। সাক্ষাতে ভুবনবাবু আমায় অনুরোধ করিলেন, আমি যেন মহারাণীকে তাঁহার তরফ হইতে বুঝাইয়া দিই যে নূতন যে সকল বন্দোবস্তের কথা উঠিতেছে, তাহাতে তিনি কদাপি সম্মত না হন। বর্ত্তমান ম্যানেজারের সঙ্গে তাঁহার যে সকল সর্ত্ত ছিল, ইহা তাহার বিপরীত কথা, অতএব মহারাণী তাহাতে বাধ্য নহেন। তাঁহার উচিত স্বয়ং পুনরায় সকল ভার গ্রহণ করিয়া কাজ করেন; আর সেজন্য উপযুক্ত লোক কাহাকেও মন্ত্রী করার দরকার।

মহারাণী মাতার সহিত সাক্ষাৎ হইলে জানিতে পারিলাম যে কুমার তাঁহার মন্ত্রিগণের পরামর্শে মাতাকে অবিলম্বে শ্রীবৃন্দাবন পাঠাইতে চান। মা তাহাতে ইচ্ছুক নহেন, কিন্তু গত রাত্রে কুমার তাঁহার হাতে পায়ে ধরিয়া তাঁহাকে সম্মত করিয়াছেন। মহারাণী বলিলেন, না গিয়া তিনি কি করিবেন, কুমারের সহিত কলহ তাহা হইলে অনিবার্য্য। এই সব কথা হইতেছে এমন সময়ে কুমার

স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত। কিন্তু তখন তিনি ঠিক্ প্রকৃতিস্থ ছিলেন না। এরূপ ভাবে তাঁহাকে আর কখন মাতৃসমীপে দেখি নাই--বড় কষ্ট বোধ করিলাম। মা কুমারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সঙ্গে কে কে যাইবে? দুর্গা কেরাণী (রাজার আমলের লোক) যদি মদ না ছাড়িয়া থাকে, তাহাকে লইয়া যাওয়া হইবে না।" কুমার চুপ করিয়া রহিলেন।

নূতন বন্দোবস্তে কতকগুলি লোকের অন্ন উঠিত, সুতরাং মহারাণী মাতার তরফ হইতে ঘোর আপত্তি উঠিবে বুঝিয়াই কুমারের দল অকস্মাৎ তাঁহাকে শ্রীবৃন্দাবনে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেছিল। কিন্তু ইহা কার্য্যে পরিণত হইল না। কালাকালের কথা লইয়া গিরি সিদ্ধান্ত প্রমুখ পণ্ডিতের দল ঘোর আপত্তি উপস্থিত করিলেন।

ইহার পর রায় মহাশয় মহারাণীমাতার কাছে কোন দরবার করিতে হইলে আমাকেই পাইয়া বসিতেন। আমি কিন্তু তাঁহাকে স্পষ্টত বলিয়া রাখিলাম যে অনুরোধ ন্যায়সঙ্গত ও মাতার হিতগর্ভ না হইলে আমার দ্বারা প্রতিপালিত হওয়ার সম্ভব থাকিবে না।

ভুবন বাবু একখণ্ড কাগজে কয়টী প্রস্তাব করিয়া মহারাণী মাতার নিকট পেস্ করিবার জন্য আমায় দিলেন। বারম্বার বলিলেন উহা তিনি ফিরাইয়া চান, নহিলে অন্যে দেখিলে তাঁহার সমূহ বিপদের সম্ভাবনা।

দেখিয়া মাতা বলিলেন, "তুমি যা বলিয়াছিলে সত্য, সার কথা আছে বটে, বিশেষ কয়টীতে আমার নিজের মঙ্গলের কথা আছে। কিন্তু আমি কি করিব? আর উহাতে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা নাই।" পরদিন পুনরায় বলিয়াছিলেন—"* * রায় মহাশয় পূর্ব্বে ঠিক্ বিপরীত চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কুমার ত আগে জমিদারী কাজকর্ম্মে বড় একটা আসিত না। কেবল কুশিক্ষায় এখন সকল শিখিয়াছে। *"

২৫

সে যাত্রায় সফল-মনোরথ না হইয়া রায় মহাশয় সপরিবারে গৃহে ফিরিয়া গেলেন। এই সময়ে কয় সপ্তাহের জন্য আমি পুটিয়া হইতে অনুপস্থিত ছিলাম, সুতরাং রাজ-কুমারের সঙ্গে ভুবন বাবুর আর কোন-

রূপ মনান্তরের কারণ ঘটিয়াছিল কি না বলিতে পারি না। তবে ইহা লক্ষ্য করিতাম যে বধূরাণীর পীড়াদির সময় মহারাণী বৈবাহিক এবং বৈবাহিকাকে শীঘ্র আনাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেও কুমার তাহাতে বড় গা গোছ করিতেন না।

আমাদের পুটিয়া ত্যাগের পর রায় মহাশয়েরা পুনরায় জামাতৃ-গৃহে আসিয়াছিলেন। এবং আর একবার কুমারকে নিজের মতে আনিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা পাইয়াছিলেন। ইহার ফলে যে গুরুতর মনোভঙ্গ উভয়ের অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইল, কখনও তাহার অপনোদন হয় নাই।

সচরাচর রাজবাটীর নিয়ম এই যে বধূরাণীদের পিতৃ বা মাতৃকুলের আত্মীয়েরা সহসা রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করিতে পারেন না। কন্যার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইলে পিতাকেও গৃহকর্ত্রীর অনুমতি লইতে হইবে। ভুবন বাবু এই নিয়ম মানিয়া চলিতেন না। গৃহস্থ বাড়ীর মত যখন তখন তিনি অন্তঃপুরে চলিয়া যাইতেন এবং বধূরাণীর

প্রকোষ্ঠে অনেকক্ষণ ধরিয়া অবস্থিতি করিতেন। বিবাহের প্রায় অব্যবহিত পর হইতেই এইরূপ ঘটায় বড় অসুবিধা হইল। অন্য কোন দরবারে এই অবারিত যাতায়াত সম্ভব হইত না—এবং মহারাণী-মাতার চক্ষুলজ্জা বড় বেশী বলিয়াই তিনি পরিজন-বর্গের অসন্তোষ উপলব্ধি করিয়াও ইহাতে কখন উচ্চ বাচ্য করিতেন না। কিন্তু নিজের আবরু রক্ষার জন্য সে প্রকোষ্ঠ তাঁহাকে ত্যাগ করিতে হইল। পুত্রবধূ এবং তাঁহার দলবলের অবস্থিতির জন্য প্রায় সমস্ত বাড়ী ছাড়িয়া দিয়া অতঃপর তিনি ছোট বাড়ীর চত্বরে বাস করিতেন।

বধূরাণীদের আত্মীয়-স্বজনের অবারিত পুরপ্রবেশ সম্বন্ধে প্রায় সকল রাজপরিবারে যে কঠোর বিধি-নিষেধের চলন অন্ততঃ সে কালে ছিল, আপাত-দৃষ্টিতে অসঙ্গত মনে হইলেও তাহা একটা বিশিষ্ট নৈতিক ভিত্তির উপর স্থাপিত। প্রায়শ হীনাবস্থার লোকেরাই রাজাদিগকে কন্যাদান করিতেন; অতএব রাজোচিত শিক্ষা-দীক্ষা-লাভের জন্য বিবাহের

পর পিত্রালয়ের সংশ্রব তেমন ঘনিষ্ঠ রাখা বাঞ্ছনীয় হইত না। রায় মহাশয় মহারাণীর ভদ্রতায় উৎসাহিত হইয়া সেই চিরাচরিত প্রথার উচ্ছেদ সাধন করায় লাভ বড় হয় নাই। বধূরাণী তাঁহার প্রাতঃস্মরণীয়া শ্বশ্রূর সহবাসে প্রথম হইতে অভ্যস্ত হইলে উত্তর কালে যে অশান্তি ঘটিয়াছিল, তাহা কদাপি সম্ভবপর হইত না।

সে যাহা হউক, পুনরায় জামাতৃ-গৃহে আসিয়া ভুবন বাবু কিছুদিন মধ্যে কুমারকে আবার বৈষয়িক পরামর্শ দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথম প্রথম কুমার মহাশয় নীরবে সকল শুনিয়া যাইতেন, কিন্তু কুসংসর্গের ফলে অভ্যাস দোষে তিনি ইদানীন্তন আর বড় প্রকৃতিস্থ থাকিতেন না। রায় মহাশয় বোধ হয় আদৌ বুঝিতে পারেন নাই যে দত্তকগৃহীতা মাতা হইলেও মহারাণীর প্রতি কুমারের অসীম ভক্তি ছিল, তাঁহার নিন্দা কখন তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। এদিকে মাতা বৈবাহিকের পরামর্শ গ্রহণ করিতে না পারায় তাঁহাদের কাছে এতই

অপরাধিনী হইয়া পড়িয়াছিলেন যে সম্প্রতি বধূরাণীর প্রকোষ্ঠে তাঁহার কার্য্য-প্রণালীর তীব্র সমালোচনা অহোরাত্র ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইত। কথাগুলার কতক কতক মহারাণীর কাণে না উঠিত এমত নহে। সেই পরীবাদে বালিকা বধূ পর্য্যন্ত যোগদান করিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন শুনিয়া মাতা সত্য সত্যই বড় ক্ষুণ্ণ হইতেন। প্রথমে বিশ্বাস করিতেন না, কিন্তু শেষে যখন আর অবিশ্বাসের স্থান থাকিত না তখন সংবাদবাহিকাদিগকে নিরুৎসাহী করিবার জন্য বলিতেন—"যখন ছেলের বিবাহ দিয়াছি, ঐ বউ লইয়াই ত ঘর করিতে হইবে।" মাতার কুৎসা শুনিয়া কুমার একদিন মহা বিরক্ত হইয়া উঠিলেন এবং মার কাছে গিয়া রায় মহাশয়ের সকল কথা বলিয়া দিলেন। সব শুনিয়া মহারাণী বলিলেন— "কোকন, তুমি আমার দত্তকপুত্র। তোমার শ্বশুরের সব কথা কি আমায় বলা উচিত? তিনি হলেন তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী, তাঁর পরামর্শের উপর আমার কথা তোমার শোনা কর্ত্তব্য হয় না।"

ইহাতে কুমার উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। বলিতে লাগিলেন যে সে সব কিছু আমি শুনিব না, আর রায় মহাশয়ের ঐ সব কথা মুকাবেলা করিয়া দিব। তৎক্ষণাৎ তিনি শ্বশুরকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন, কিন্তু তিনি তখন ভিতরে আসিতে অনিচ্ছুক। কুমার ছাড়েন না, লোকের উপর লোক ছুটিল। শেষে রায় মহাশয় আসিলে কুমার তাঁহাকে বারান্দায় বসাইলেন এবং মাতাকে কপাটের অন্তরালে রাখিয়া প্রশ্ন করিলেন—"কেমন রায় মহাশয়, আপনি আমার কুঠরীতে বসিয়া আজ বলিয়াছেন যে মহারাণী তোমায় অসিদ্ধ করিবেন, জমীদারী তোমাকে দিবেন না। সকল সম্পত্তি কেবল দান করিয়া আর ভগ্নীকে দিয়া শেষ করিবেন। আমি ঢাকা হইতে লোক আনাইয়া তোমার জমীদারী তোমায় দেওয়াইব। মহারাণী বিষয় কর্ম্ম ভাল বোঝেন না! এ সব কথা কেন আমায় বলিলেন? আপনার অভিপ্রায় কি?" রায় মহাশয় দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন—"বাবাজি, এ সব কথা কখন আমি

বলিয়াছি ? আমি কিছু বলি নাই, আপনি আমার উপর মহারাণীর মন চটাইয়া দিবার জন্য এ সকল বলিতেছেন। আপনি আমার মনে বড় আঘাত দিলেন।” কুমার রুদ্ধ দ্বারের অদূরে মাতার কাছে দাঁড়াইয়াছিলেন, অত্যন্ত রাগিয়া উঠিয়া আত্ম-হারা হইলেন। “কি আমি মিথ্যা বলিয়াছি, আর আপনার মনে আঘাত দিয়াছি!” তিনি সজোরে বাহির হইয়া রায় মহাশয়ের দিকে রুখিয়া আসিতে-ছিলেন, মহারাণী তাঁহার হাত ধরিয়া নিবারণ করিলেন।

কুমারের এই অধীরতার দৃশ্য যে মহারাণী-মাতার চক্ষে বড় বীভৎস দেখাইল তাহা বলা বাহুল্য। তিনি তাঁহাকে মৃদু অনুযোগ করিয়া অনেক বুঝাইলেন। কুমার অতিশয় উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, মার কাছে ভৎর্সিত ও প্রতিরুদ্ধ হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পরে বলিলেন “মা আপনার নিন্দা আমার কাছে করিবে ? ওরা সকলেই আপনার নিন্দা করে। যদি আমার নিন্দা

আমার কাছে করে, তাহাও সহ্য হয়, কিন্তু আপনার কুৎসা আমার কাছে করিবে এতদূর সাধ্য ?” মা অশ্রুমোচন করিয়া বলিলেন “কোকন, তোমার শ্বশুর এবং স্ত্রীর কোন কথা আমায় বলিতে নাই !”

রায় মহাশয় জামাতার এই ব্যবহারে নিরতিশয় ক্ষুণ্ণ হইলেন, কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া মহারাণীর উদ্দেশে বলিলেন “আমি বিদায় হই। আমার উপর জামাতা বাবাজীর মন না ফিরিলে আর আমি আসিব না। বেণারসে হয় ত আপনার সঙ্গে দেখা করিব।” তিনি তৎক্ষণাৎ রাজবাড়ী ত্যাগ করিয়া গেলেন।

মহারাণী নিজের পিত্রালয়ে তাঁহার সপরিবারে কয়দিন অবস্থানের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। কুমার এতদূর অপ্রসন্ন হইয়াছিলেন যে, বধূরাণীকে তাঁহার পিতামাতার সহিত আর সাক্ষাৎ করিতে দিবেন না স্থির করিলেন। কিন্তু মাতৃস্বসা শ্রীসুন্দরী দেবীর অনুরোধে শেষে তাহাতে আর আপত্তি করিতে পারিলেন না। বধূরাণী মহারাণীমাতার

সঙ্গে বাবুর বাড়ীতে গিয়া বাপ-মার সহিত মিলিত হইলেন। এ দিকে মহারাণী নিজে বৈবাহিক ও বৈবাহিকাকে অনেক করিয়া বুঝাইলেন এবং ছেলের অপরাধের জন্য তাঁহাদের নিকট বারম্বার ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তাঁহারা অতঃপর আর প্রত্যাগমন করিবেন না বুঝিয়া তিনি বহুমূল্য বস্ত্র ও অলঙ্কার তাঁহাদিগকে উপঢৌকন দিলেন, যাতায়াতের সমস্ত খরচ নিজের তহবিল হইতে নির্ব্বাহ করিলেন। কুমার ইহাতে বিরাগ প্রকাশ করিলে তাহা গ্রাহ্য করিলেন না।

২৬

১২৯০ সালের বৈশাখ মাসে রাজকুমার বয়ঃ-প্রাপ্ত হওয়ায় মহারাণী বিষয়ভার সম্পূর্ণরূপে তাঁহাকে অর্পণ করিলেন। ইহার কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই আমি পারিবারিক পীড়াদির জন্য কলিকাতায় ছিলাম এবং পরে বঙ্কিমবাবু প্রমুখ হিতৈষী বন্ধু-বান্ধবগণের পরামর্শে সাহিত্যকে জীবিকাস্বরূপ করিয়া তথায় স্থায়ী হইবার উদ্যোগ করিতেছিলাম।

এই সময়ে পূর্ব্বের মত মাতার নিকট থাকিয়া তাঁহার ইষ্টচেষ্টা করা অভিপ্রেত হইলেও ঘটনাধীনে আমার পক্ষে তাহা সুদূরপরাহত হইয়া উঠিল। যাহা হউক সর্ব্বদা তিনি আমাদের সম্বাদ লইতেন এবং বিশেষ গুরুতর কোন কথা থাকিলে জানাইতেন। কিন্তু ইহাতে সব সময়ে প্রকৃত অবস্থা বুঝিবার সুবিধা হইত না। পূর্ব্বে খবর পাইয়াছিলাম ইদানীং তিনি অধিকাংশ সময় পিত্রালয়ে অবস্থিতি করিতেছেন। শেষে শ্রাবণ মাসে আমার এক বাল্যবন্ধু পুটিয়া হইতে আসিয়া জানাইলেন, মহারাণীর ইচ্ছা যেন ২।৩ দিনের জন্যও তাঁহাকে আমি একবার দেখিতে যাই।

এই সময়ে পিতৃদেব রাজসাহী গিয়াছিলেন। বলীহার অঞ্চল হইতে পুটিয়ায় পৌঁছিয়া তিনি আমায় পত্র লিখিলেন যে ২৪শে শ্রাবণ মহারাণী-মাতার কাশী-যাত্রার দিন অবধারিত হইয়াছে এবং এই সময়ে তিনি আমায় একবার দেখিবার অভি-প্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে আমি অবশ্য

মাতৃচরণ সন্দর্শনের জন্য চঞ্চল হইলাম। কিন্তু তখন কয়খানি সাময়িক পত্রের সহিত যোগদান করিয়াছিলাম, সহসা রাজধানী ত্যাগের উপায় ছিল না। বিশেষ ঠিক এই সময়েই আমাদের কৈশোর কালের বন্ধু রাজশাহীর বিখ্যাত ছাত্র রাধাগোবিন্দ দাস এম, এ, বড় পীড়িত হন, তাঁহার জীবন সংশয় হইয়া উঠিয়াছিল। ডাক্তার এবং কবিরাজেরা জবাব দিলে আমরা রাজশাহীর সহপাঠী বন্ধুগণ এবং রোগীর অন্যান্য সুহৃদ্‌বর্গ একমত হইয়া হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলাম। শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় এবং স্বর্গীয় বাবু দ্বারিকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় এই বিষয়ে বিস্তর সহায়তা করিয়াছিলেন। প্রাতঃস্মরণীয় রাজা বাবু এবং ডাক্তার সরকার চিকিৎসা করিয়াছিলেন। শেষোক্ত মহোদয়কে "ভিজিট" দিবার জন্য রাধা-গোবিন্দের ছাত্রবন্ধুরা চাঁদা তুলিলেন— কেননা তিনি দরিদ্র সন্তান, ইদানীং উত্তরপাড়া স্কুলের শিক্ষক হইলেও দীর্ঘকাল রোগশয্যায় পড়িয়া থাকায়

তাঁহাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইয়াছিল। চাঁদার কথা শুনিয়া ডাক্তার সরকার ভিজিট লইতে অস্বীকার হইলেন, বলিলেন আমাকেও চাঁদা-দাতৃগণের মধ্যে ধরিয়া লও।

রাজা বাবু এবং ডাক্তার সরকারের কথা যদি উঠিল, তবে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও তাঁহাদের সম্পার্কে এখানে কিছু বলার দরকার মনে করিতেছি। বিখ্যাত অক্রূর দত্তের বংশধর রাজেন্দ্রনাথ দত্ত অসাধারণ দানশীলতার জন্য রাজাবাবু নামে সর্ব্বত্র পরিচিত ছিলেন। এদেশে সর্ব্বপ্রথমে তিনি হোমিওপ্যাথির চর্চ্চা করেন এবং সত্যব্রত ডাক্তার সরকার তাঁহারই যত্নে এলোপ্যাথি ছাড়িয়া হ্যানি-ম্যানের পন্থানুসরণ করিয়াছিলেন। ফলতঃ সরকার তাঁহাকে পিতৃতুল্য জ্ঞান করিতেন এবং সেই তেজস্বী মহাপুরুষকে কেবল এক রাজা বাবুর কাছেই প্রণত হইতে দেখিয়াছিলাম। লর্ড রিপণকে সম্বর্দ্ধনার জন্য টাউনহলে যে মহতীসভার অধিবেশন হয়, তাহাতে ডাক্তার সরকারের বক্তৃতা ভাবৈশ্বর্য্যে

এবং ভাষার গৌরবে বড় সুন্দর হইয়াছিল। রাজেন্দ্র বাবু স্বয়ং সে সভায় উপস্থিত ছিলেন না, বক্তৃতার প্রশংসা শুনিয়া তাঁহার সাধ হইল ডাক্তারের নিজ-মুখে তাহার পাঠ শুনিবেন। প্রায় পঁচিশ বৎসর পরে দত্তবাড়ীর বৈঠকখানায় উভয়ের সে সান্ধ্য-মিলন আমার মনে পড়িতেছে। ডাক্তার যতক্ষণ পাঠ করিলেন, রাজা বাবু মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাহা শুনিলেন এবং পরে আনন্দে বিহ্বল হইয়া তাঁহার মাথায় নিজের পদযুগল স্থাপন করিলেন। তারপর স্নেহ-কোমলকণ্ঠে মাহিন্দির—(এই আদরের নামেই সচরাচর তিনি মহেন্দ্র বাবুকে ডাকিতেন)—মাহি-ন্দির বেঁচে থাক্ বাবা, তোর এ বক্তৃতার মত বক্তৃতা একবার মাত্র হাইকোর্টে বিলাতী ব্যারিষ্টারের মুখে শুনিয়াছিলাম। রাজা বাবু ব্যারিষ্টারটির নাম করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা এখন মনে করিতে পারিতেছি না। বস্তুত ডাক্তার মহেন্দ্রলালকে তিনি ছেলের মত ভাল বাসিতেন। যখনকার কথা বলিতেছি, ডাক্তারের বয়স তখন ন্যূনাধিক পঞ্চাশ

বৎসর। তাঁহার চিকিৎসাধীন এক রোগিণীকে দেখিতে দেখিতে রাজা বাবু একদিন বলিলেন "মাহিন্দির ছেলে মানুষ, রোগ ঠিক্ বুঝিতে পারিতেছে না।" আর একদিন কথায় কথায় তিনি বলিতেছিলেন, "মাহিন্দিরকে এত ভালবাসি কেন তা জান ? তার মত সত্যানুরাগী সত্যানুসন্ধিৎসু দেখা যায় না। আগে আমাকেই উপহাস করিয়া বলিত, "মহাশয়, বে অফ বেঙ্গলে এক ফোঁটা ঔষধ ফেলিয়া মনে করেন জগন্নাথের ঘাটে তাহার কাজ হইবে। কিন্তু তার পর ক্রমে যখন হোমিওপ্যাথিতে বিশ্বাস করিল, সর্ব্বস্বপণ করিয়া তাহার আলোচনা ও উন্নতিতে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে।"

রাজেন্দ্র বাবু কেবল পরোপকারের জন্যই বেরিনি সাহেবের কাছে হোমিওপ্যাথি শিক্ষা করিয়াছিলেন। এবং চিরজীবন নিজব্যয়ে রোগীর দ্বারে অহোরাত্র ঔষধ পথ্য বিতরণ করিয়া বোড়ানই তাঁহার ব্রত ছিল। গল্পে গল্পে আমাদিগকে একবার বলিয়াছিলেন যে হোমিওপ্যাথির জন্য সাত লক্ষ

টাকা নিজজীবনে ব্যয় করিয়াছেন। বলিতেছিলেন হোমিওপ্যাথি কলেজ করিবার ইচ্ছা তাঁর ছিল কিন্তু "কি বলিব অক্রূরের টাকা আর রহিল না!" ঐদিন বলিয়াছিলেন, তাঁহার বিশ্বাস, হোমিও-প্যাথির সম্যক চর্চ্চা হইলে মনুষ্যসমাজে পাপ থাকিবে না, পুলিশ রক্ষার প্রয়োজন হইবে না। সে দিন আমার সঙ্গে শ্রীমান্ রাধিকানাথ সেন উপস্থিত ছিলেন, তিনি তার পর ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়া বর্ম্মা প্রদেশে ব্যবসা করিতেছেন। রাজা বাবুর উক্তিটা আমাদের উভয়ের কাছে ভারি অদ্ভুত রকমের শুনাইল। সেটা লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন, "তবে একটা গল্প শোন। আমার হোমিও-প্যাথি চর্চ্চার প্রথমাবস্থায় কয়লাঘাটায় ডিস্‌পেন্-সারি করিয়াছিলাম। একদিন প্রাতঃকালে যথারীতি রোগীদিগের ঔষধ বিতরণ করিতেছি এমন সময়ে এক কৃষ্ণকায় শুষ্কমূর্ত্তি ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত। লোকটির ধূলিপূর্ণ খালিপা, চক্ষু কঠোর দৃষ্টিব্যঞ্জক। আমায় বলিলেন, তোমার চিকিৎসার নাম-ডাক

শুনিয়া প্রায় দশক্রোশ হাঁটিয়া আসিয়াছি। আমার চিকিৎসা কর দেখি, আজ দশবছর কাল রাত্রে আমার ঘুম নাই, একটু তন্দ্রা আসিলেই মনে হয় বিছানায় ঐ সাপ, বিছা উঠিতেছে। আমি ব্রাহ্মণকে বলিলাম ঠাকুর, স্নানাহার করুন, বেলা দুইটার পর আপনাকে ঔষধ দিব। ব্রাহ্মণঠাকুর ইহাতে উগ্র হইয়া উঠিলেন—কি তুমি কায়স্থ তোমার বাড়ীতে আমি অন্ন গ্রহণ করিব? আমি দেখিলাম এই খিট্‌খিটে উগ্রভাব ইহা রোগের লক্ষণ মাত্র। অতএব বিনীত ভাবে বলিলাম,—না ঠাকুর তাহা বলি না। যেখানে ইচ্ছা স্নানাহার করিয়া দুইটার আমলে তুমি আসিও। তার পর সেই সময়ে ব্রাহ্মণ আসিলে রোগের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ শুনিয়া শিশিতে তিন দিনের ঔষধ দিলাম। ইহার দুই দিন পরে ঠাকুরটি আবার আসিয়া উপস্থিত। আমায় পদধূলি দিয়া বলিলেন—বাবা, তোমার কল্যাণে এতদিন পরে সুনিদ্রা হইয়াছে। ক্রমে এই রোগী সম্পূর্ণ সারিয়া উঠিলে একদিন তাহার কয়টি ভাই আমায় আশীর্ব্বাদ

করিতে আসিল, তাহারা বলিল, উনি আমাদের বড় ভাই, আমরা শৈশবে পিতৃহীন হওয়ার পর হইতে বরাবর উনিই আমাদের অভিভাবক এবং অতিশয় যত্নে আমাদিগকে লালন পালন করিয়াছিলেন। কিন্তু গত কয় বৎসর এই অনিদ্রার রোগ হওয়ার পর তাঁহার কেমন এক ভাব হইয়াছিল, সকলের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ, বিষয় আশয় লইয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করিয়াছেন। কিন্তু আপনার ঔষধ সেবনের পর আবার যে মানুষ তাহাই হইয়াছেন, কি করিয়া ইহা সম্ভব হইল? আপনি যেন মন্ত্রবলে অসাধ্য সাধন করিয়াছেন, আমি চিকিৎসার বই পড়িয়া তাঁহা-দিগকে বুঝাইয়া দিলাম, কি কি লক্ষণে আমার দত্ত ঔষধ খাটিতে পারে। ব্রাহ্মণেরা আশ্চর্য্য হইয়া আমায় আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে চলিয়া গেলেন।"

মিষ্ট ব্যবহার এবং মিষ্ট কথায় রাজা বাবু তাঁহার সুদীর্ঘ জীবন লোক-মনোহর করিয়াছিলেন। তাঁহাকে একবার বলিতে শুনিয়াছিলাম যে জয়পুরের মহারাজার চিকিৎসার্থ নিমন্ত্রিত হইয়া যাওয়ার পর

তথায় তাঁহার বিরক্তির কতকগুলি কারণ উপস্থিত হয়। পুরাদরবারে সেজন্য তিনি স্পষ্ট কথা এরূপ মিষ্টভাবে শুনাইয়াছিলেন যে, কোন অকৌশল ঘটিতে পায় নাই।

এ বিষয়ে ডাক্তার সরকার গুরুর পন্থানুসরণ করিতেন না। তিনি যে সাধারণতঃ লোকপ্রিয় ছিলেন না, তাঁহার নির্ভীকতা এবং স্পষ্টবাদিতাই তাহার একমাত্র কারণ। কিন্তু তাঁহাকে যে ভাল করিয়া জানিত তদীয় হৃদয়-সৌন্দর্য্যে তাহাকেই মুগ্ধ হইতে হইত। ফলতঃ সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী বিজ্ঞানবিদের কঠোর বহিরাবরণের ভিতর যে মমতা এবং পরদুঃখ-কাতরতা তিনি পোষণ করিতেন, তাহা যথার্থই অলৌকিক। দারিদ্র্যই যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারী-জাতির পদস্খলনের কারণ সে কথা একদিন আমার সঙ্গে হইতেছিল। বলিতে বলিতে তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন এবং অস্ফুটস্বরে আপনা আপনি বলিলেন "উঃ! আমরা কি করিতেছি।" আর একদিন বলিয়াছিলেন—"দেখ লোকের দুঃখে কষ্টে

আমি যে আন্তরিক সমবেদনা অনুভব করি, তার কারণ বড় কষ্টে নিজে মানুষ হইয়াছি।”

এই উভয় মহানুভবের চরিত্রে আমি কতকগুলি ভাব লক্ষ্য করিতাম যাহা মহারাণী মাতা ছাড়া পূর্ব্বে আর কাহাতেও দেখি নাই। ডাক্তার সরকার মহারাণীর কথা উঠিলেই তাঁহাকে “রমণীকুলের আদর্শ” বলিয়া প্রশংসা করিতেন। ইহাতে যথার্থই আমি গৌরব বোধ করিতাম।

রাজাবাবু এবং ডাক্তার সরকারকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম রাধাগোবিন্দ মারা যে যাইবেই এমন কোন কথা নাই,—ভাল হইতেও পারে। অতএব তাঁহার সম্বন্ধে কতকটা নিশ্চিত হইয়া ২২শে শ্রাবণ রাত্রে আমি পুটিয়া যাত্রা করিলাম।

পরদিন নাটোর ষ্টেসনে পৌঁছিয়া খবর পাইলাম মহারাণীমাতার কাশী গমন স্থগিত হইয়াছে।

সেই দিন অপরাহ্নে তাঁহাকে প্রণাম করিতে গেলাম। দেখিলাম কয়মাসে মার মূর্ত্তি শুষ্ক শীর্ণ মলিন হইয়াছে, সেই জ্যোতির্ম্ময় মুখে বিষাদের

ক্যালিমা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। আমায় দেখিয়া স্নেহের হাসি হাসিলেন। সেই ক্ষীণ হাস্ত রেখায় উদ্ভাসিত মাতৃমূর্ত্তিতে যুগপৎ আমি অসীম, ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার এবং আত্মোৎসর্গ ও সকল বিষয়ে ভগবানের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরের ভাব প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। এই সুদীর্ঘকাল পরে যখনই সে স্বর্গীয় মূর্ত্তি মানস-নেত্রে দেখিতে পাই, সেই দিনকার কথাই বিশেষরূপে মনে পড়ে।

সম্পূর্ণ।